নাগরিক মঞ্চের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৩

পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত শ্রমিক

পশ্চিমবঙ্গের

আক্রান্ত শ্রমিক

১৯৯৩

নাগরিক মঞ্চের বার্ষিক প্রতিবেদন

© নাগরিক মঞ্চ

প্রকাশ : মে ১৯৯৩

প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চের পক্ষে তপস্যা ঘোষ

১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

রুম নং ৭ ব্লক বি, কলকাতা - ৭০০০৮৫

মুদ্রক : বোস প্রেস

১০, আশুতোষ শীল লেন,

কলকাতা - ৭০০০০৯

অক্ষরবিন্যাস : বসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার

১০বি আশুতোষ শীল লেন

কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : তাপস সরকার

দাম : ১৩ টাকা

আমাদের কথা

বন্ধ কলকারখানার তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। দ্রুত বাড়ছে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে সার সার বন্ধ কারখানাগুলো যেন নিকষ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ কারখানার শ্রমিক এবং তাঁদের মজদুর লাইনে ঘুরে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি পরিস্থিতির গভীরতা। এক ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে সব মিলিয়ে: শুধুই অনাহার, মৃত্যু আর আত্মহত্যার বিবরণ যেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' বইটিতে এই তথ্যগুলো গরহাজির। সেখানে মনগড়া সাফল্যের হিসেব। আর ব্যর্থতাকে দেখানো হয় খাটো করে।

অসংগঠিত শিল্পে ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি এবার আলোচনা করা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানায় হাজির হয়ে সমীক্ষা করার ওপর। ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম তার 'শ্রমিক-বান্ধব' ভাবমূর্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমনি সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখা গেছে শিল্প-দূষণ, দুর্ঘটনা ও পেশাজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধের ব্যাপারে। ই. এস. আই-এ ওষুধ নিয়ে দুর্নীতি প্রসঙ্গে দীর্ঘ রচনা আছে এবারের সংকলনে। রচনাটি অনুসন্ধানমূলক। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বকেয়ার তালিকা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘতর হয়েছে আগের বছরের তুলনায়। পি এফ সংস্থার ব্যর্থতা আর সাফল্যের দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে বকেয়া পি এফ-এর তালিকার ভিত্তিতে। মহিলা শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে এবার একটি পৃথক নিবন্ধ। মেটারনিটি বেনিফিট বিষয়ক এই লেখাটিতে দেখান হয়েছে মহিলাদের মৌলিক অধিকারটুকু দিতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর কী কার্পণ্য। এবারের সংকলনে আরও একটি সংযোজন 'শ্রমের পরিভাষা'। শিল্প-কারখানার চত্বরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু কিছু শব্দকে আমরা চিনিয়ে দিতে চেয়েছি।

এবারের লেখাগুলোয় আমরা সরকারি যে তথ্য উল্লেখ করেছি, তা বেশিরভাগই ১৯৯২ সালের। এবং সাম্প্রতিকতম ঐ তথ্যের ভিত্তিতেই আলোচনাগুলো হয়েছে। যাঁদের কথা ভেবে প্রতি বছর এই প্রতিবেদন তৈরি করা, সেই শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের সাহায্য করবে এই আশা নিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধ চেষ্টা। সীমাবদ্ধতা আছে, অসম্পূর্ণতাও রয়েছে; তবু বিকল্প উদ্যোগের খোঁজে যাঁরা আছেন, এই সংকলন তাঁদের কিছুটা কাজে লাগলে আমাদের উদ্যোগ সার্থক মনে করব।

না গ রি ক ম ঞ্চ

সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ	৫
বন্ধ কলকারখানা	১২
ন্যূনতম মজুরি	১৯
ই এস আই মেটারনিটি বেনিফিট আইন	২৮
শিল্পে দূষণ, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানি	৩৪
ই এস আই মেডিকেল বেনিফিট ১৯৯২	৪৩
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	৫৩
শ্রমের পরিভাষা	৬৩

এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন

অজিত নারায়ণ বসু, নব দত্ত, অসীম মুখোপাধ্যায়, স্বাতী, বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলন দত্ত, কাজল রায়, তপস্যা ঘোষ, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়, নাজেস আফরোজ, আসানসোল সিভিল রাইটস অ্যাসোসিয়েশন, বিপ্লব ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী, পল্লব ভট্টাচার্য, জয়ন্ত গুপ্তভায়া, বীরেন রায়, চিত্ত সরকার, ফণীগোপাল ভট্টাচার্য, নিতাইচন্দ্র দাস, পরেশচন্দ্র দেবনাথ, অজয় দাশগুপ্ত, সুমিতরতন কর, অশোক ঘোষ, বিজয় বিশ্বাস, সুজিত মজুমদার, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, সুধীর মিত্র, অলক মুখার্জি, রঞ্জিত সিং, মান্না।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষ

আত্মনির্ভরশীল সংগঠনের অভাব

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এর একটা বড় কারণ, রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। কিন্তু সরকারের যা চরিত্র, তাতে সরকার আগ বাড়িয়ে এসে অবস্থার উন্নতি ঘটাবে -- এমন আশা অলীক। অবশ্য দুরবস্থার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই শ্রমজীবী মানুষের নিজেদেরই অক্ষমতা। সংগঠিত হতে না পারার অক্ষমতা। আত্মনির্ভরশীলভাবে নিজেদের পথ নিজেরাই স্থির করতে না পারার অক্ষমতা। দেশ পরিচালনায় যোগ্য ও সচেতনভাবে অংশ নিতে না পারার অক্ষমতা। এর ফলে শুধু শ্রমজীবী মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত নন, গোটা দেশই আজ বিপন্ন।

কর্মীদের বিভিন্ন ভাগ

১৯৯১ সালে জনগণনা থেকে জানা যায়, ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গে মালিকসহ উপার্জনকারী (কর্মী) মানুষের সংখ্যা ছিল ২০৫ লক্ষ। (এই সংখ্যা হিসেব করার সময় ঘরের কাজে নিযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা ধরা হয় নি।) সরকারি হিসেবের ঐ কর্মীদের মধ্যে ১৪০ লক্ষ বা মোট কর্মীর ৬৮%-এর বেশি হচ্ছে কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কর্মী। শেষোক্ত এই কর্মীদের মধ্যে ৮০ লক্ষ বা ৫৭% প্রধানত মজুর। ৫৪ লক্ষ বা প্রায় ৩৯% মালিক-কর্মী, যাঁরা প্রধানত নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের জমি চাষ করেন বা তাঁত ইত্যাদি চালান। এই দুভাগ মিলে মোট শ্রমজীবী মানুষের ৯৬%। এঁরা অবশ্য শ্রমিকদের শোষণ করেন না। বাকি ৬ লক্ষাধিক বা ৪% মালিক। এঁরা প্রধানত মজুর খাটিয়ে নিজেদের জমিতে বা তাঁত ইত্যাদিতে উৎপাদন করান।

দেশ এখন চলে প্রধানত ঐ ৪% মালিক জাতীয় মানুষের স্বার্থে। ৯৬% প্রধানত অসংগঠিত শ্রমজীবীরা ভোট দেওয়া বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের বা দেশের ভাগ্য নির্ধারণে এখনও কোন সচেতন অংশ নিতে পারেন না। ফলে তাঁরা বেশিরভাগ সময়েই মালিকদের কোন না কোন ভাগের সঙ্গেই এখন পর্যন্ত থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

মজুরদের বিভিন্ন ভাগ

পশ্চিমবঙ্গের মজুরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হল মজুরিনির্ভর ভূমিহীন কৃষিকর্মী এবং এক একরের কম জমির মালিক অতি গরীব প্রান্তিক চাষী। এই গরীব প্রান্তিক চাষীদেরও প্রধান আয়ের সূত্র অন্যের জমিতে মজুরি। ১৯৯১ সালে এই মোট কৃষি মজুর কর্মীর সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ। কৃষি এবং শিল্প মিলিয়ে মোট ৮০ লক্ষ মজুরের মধ্যে এই কৃষি মজুরদের শতকরা অংশ হচ্ছে ৮৪ ভাগ। মোট শিল্প মজুরের সংখ্যা ১২.৪ লক্ষ, এদের মধ্যে ৮.৮ লক্ষ হচ্ছে সংগঠিত অংশে বা রেজিস্টার্ড কারখানায় এবং বাকি ৩.৬ লক্ষ হচ্ছে অসংগঠিত অংশে বা গ্রামীণ ও কুটির শিল্প ও খুব ছোট কারখানায়। এই কৃষি মজুর এবং শিল্পের মজুরের আর্থিক অবস্থা আগের বছরের তুলনায়

অনেক খারাপ হয়েছে।

কৃষি মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯২-৯৩ সালের আর্থিক সমীক্ষা মাত্র গত মাসে প্রকাশ করেছেন। তার এক জায়গায় তথ্য রয়েছে যে কৃষিতে পুরুষ মজুরদের মজুরির হার চলতি টাকার অংশে দৈনিক ১৯৯০-৯১ সালের ২১.৫০ থেকে ২৩.৬৩ টাকা হয়েছে, অর্থাৎ গত বছরে মজুরির পরিমাণ ৯.৯% বেড়েছে। এই বৃদ্ধিকে সরকারি সাফল্য হিসেবে ধরে গর্ব করে ঐ সমীক্ষায় বলা হয়েছে 'এই কর্মসূচীগুলির রূপায়ণ এবং উৎপাদনের কাজে দরিদ্র মানুষদের সামিল করবার মূলনীতি অনুসরণের ফলে, রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি মজুরিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।" (পৃঃ ১৭)

ঐ সমীক্ষা রিপোর্টটিরই পরিশিষ্টের ১৮৩ পাতার ১০.১ তালিকায় কৃষি মজুরদের ব্যয়ের যে সরকারি হিসেব প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখতে পাই যে ১৯৯১-৯২ সালে কৃষি মজুরদের ব্যবহৃত পণ্যের দাম আগের বছরের তুলনায় ১৬.২% বেড়েছে অর্থাৎ টাকার অঙ্কে যখন মজুরি বেড়েছে ৯.৯%, তখন মজুরদের জীবন যাত্রার ব্যয় সরকারি হিসেবেই বেড়েছে ১৬.২%। তাই গত বছরে পুরুষ কৃষি মজুরদের সত্যিকারের আয় কমেছে ৫.৪%।

এই দু বছরের মধ্যে কৃষি থেকে মোট আয় বেশ দ্রুত গতিতে বেড়েছে। চলতি টাকার অঙ্কে এই বৃদ্ধি হচ্ছে ২০% — অর্থাৎ চলতি টাকার অঙ্কে মজুরি বৃদ্ধির হারের (৯.৯%) দ্বিগুণের বেশি। আর মূল্যবৃদ্ধিকে বাদ দিয়ে টাকার স্থিরমূল্যেও এই মোট আয় (= মালিক ও ব্যবসাদারদের সুদ, খাজনা এবং লাভ হিসাবে আয় + মজুরদের আয়) বেড়েছে ৯.৭%; ঐ একই সময়ে স্থিরমূল্যে ছেলে মজুরদের মজুরি কমেছে ৫.৪%। (এই আয় সংক্রান্ত তথ্য ঐ সমীক্ষার পরিশিষ্টের ২০ এবং ২১ পাতার ৩.০ এবং ৩.১ নম্বর সারণিতে দেওয়া আছে।)

আমাদের মত দেশে প্রধানত পুঁজির মুনাফাকে কেন্দ্র করে উৎপাদন ব্যবস্থা চলে। এই ব্যবস্থায় মোট আয় যদি বাড়ে এবং মজুরি যদি কমে বা অন্তত না বাড়ে, তার অর্থ মালিক-ব্যবসাদারদের আয় বাড়া, মোট আয়ে তাদের অংশ বাড়া এবং শ্রমিকদের অংশ কমা।

ঠিক এই ঘটনাটাই পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে, এবং এটা যে ঘটে চলতে পারছে, তার সর্বপ্রধান কারণ শ্রমজীবীদের আত্মনির্ভরশীল সংগঠনের অভাব। শহরের বড়-মাঝারি কারখানার শ্রমজীবীদের সংগঠিত হওয়ার, সচেতন ও নানা রকম খোঁজখবর নেওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও তাঁদের অসংগঠিত অবস্থা সমস্ত মজুর শ্রেণীর সংগঠনকে খুবই দুর্বল করে রেখেছে।

চলতি সমাজব্যবস্থায়, সরকারের গায়ে যে নামাবলীই জড়ান থাক না কেন, তাদের কারুরই শ্রমিক স্বার্থে কিছু করা অসম্ভব। শ্রমিকরা নিজেরা সচেতন ও সংগঠিত না হলে মালিকের অনিচ্ছুক হাত থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রমিকরা অসংগঠিত হওয়ার ফলে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারছে না — এমন কিন্তু নয়। ঐ মন্ত্রিসভা গত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আগামী বছরের বাজেট পেশ করার সময় ঐ 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা'র মাধ্যমে মিথ্যা পরিবেশন করে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। মজুরি কমা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে এমন কথা বলা হয়েছে।

ঐ ঘোষণার মধ্যে বঞ্চনার আরও অনেক দিক আছে। সেখানে মজুরির তথ্য শুধু পুরুষদের। মেয়েদের মজুরির তথ্য রাজ্য সরকার প্রকাশ করে না। প্রায় সব জায়গায় পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মজুরি কম। বঞ্চিত মহিলা মজুরদের কথা সরকারি তথ্যে অনুপস্থিত। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের আয়ের সুযোগ কম — সেটাও বলা হয়নি। সারা ভারতে মোট কৃষিকর্মীর মধ্যে ২৭.৯% মেয়ে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২.০%, পশ্চিমবঙ্গে ১৩.০%। ভারতে ভূমিহীন কৃষিমজুরদের মধ্যে ৩৮.৬% মেয়ে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫১.৩% এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯.৫%।

সরকার মজুরদের বিভ্রান্ত করার জন্য কৃষিমজুরদের ন্যূনতম মজুরি আইনমাফিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আইনে মহিলা ও পুরুষের মজুরি সমান। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে দৈনিক ৩১.১১ টাকা। সমীক্ষার তথ্য অনুসারেই ১৯৯১-৯২-এ পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাত্র ২৩.৬৩ টাকা। এই মজুরি আইনে নির্ধারিত মজুরি থেকে ২৬.৪% কম। এর সঙ্গে মহিলাদের মজুরি যোগ করে গড় করলে যে অঙ্ক পাওয়া যাবে তা ঐ ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম। তবে ন্যূনতম মজুরির তথ্য ঐ সমীক্ষায় নেই। আছে সরকারি ঘোষণায় এবং সরকার প্রকাশিত একটি বই 'লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে'। এই বইয়ে আবার কৃষি মজুররা প্রকৃত মজুরি কত পান তার হিসেব নেই। কিন্তু কৃষি মজুররা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য প্রতি ব্লকে একজন করে ইন্সপেক্টর পদ রয়েছে সে তথ্য অবশ্য এই বই থেকেই পাওয়া যায়।

কৃষি শ্রমিকদের মত, শিল্প শ্রমিকদের ব্যাপারেও সরকারি সমীক্ষা কিভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে তা আমরা এবার আলোচনা করব।

শিল্প শ্রমিকদের আয়

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে চলতি টাকার হিসেবে, প্রতি বছর আগের বছরের থেকে কর্মী পিছু বাৎসরিক আয় কতটা বেড়েছে। এই হিসেবটা দেখলে মনে হবে এই ক'বছরে শ্রমিকদের গড় আয় বেড়েছে। ১৯৮৫ সালে ১২,১০১ টাকা থেকে ১৯৯০ সালে ১৪,০০৯ টাকা বা ১৫.৮%। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগের বছরগুলোতে সমীক্ষায় যে তথ্য দেওয়া হত তা 'প্রকৃত মজুরি'র হিসেবে। সেই তথ্য থেকে স্পষ্ট করে বোঝা যেত সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কিভাবে এবং কত দ্রুত কমছে। সম্ভবত সেই কারণেই ১৯৯২-৯৩ সালের সমীক্ষায় শুধু ঐ চলতি টাকার হিসেবেই শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সমীক্ষার বিভিন্ন পাতায় ছড়ান তথ্য একত্র করে নিচের সারণিতে দেখান হল:

পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্টার্ড কারখানায় মাসে ১৬০০ টাকা বা তার কম মজুরির শ্রমিকদের অবস্থা (১৯৮৫-৯০)

সাল	গড় বাৎসরিক মজুরি (চলতি দামে)	শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের মূল্যের সূচক (১৯৬০)	গড় বাৎসরিক প্রকৃত মজুরি ১৯৬০ সালের মূল্যে
১৯৮৫	১২,১০১	৬১০	১৯৮৪
১৯৯০	১৪,০০৯	৯৬২	১৪৫২
শতকরা হারে	+ ১৫.৮%	+ ৫৭.৭%	− ২৬.৬%

সমীক্ষায় দেখান হয়েছে ৫ বছরে টাকার অঙ্কে মজুরি বেড়েছে ১৫.৮%। কিন্তু ঐ সরকারি হিসেবেই শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে মজুরির থেকে তিন গুণের বেশি হারে অর্থাৎ ৫৭.৭%। এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, এই সময়ে কত দ্রুত হারে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমেছে। এই সারণি থেকেই দেখতে পাচ্ছি উল্লিখিত ৫ বছরে সংগঠিত শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমেছে ২৬.৬%। কমেছে কর্মসংস্থানও। **ভারত সরকার প্রতি বছর সবকটি রেজিস্টার্ড** কারখানায় একটি সমীক্ষা চালান। সেই **সমীক্ষার হিসেবে ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল** পর্যন্ত কারখানার মোট আয়ে শ্রমিকদের মজুরির অংশ ৪৮%। এবার, যে তিনটি তথ্য আমরা পেলাম তা সংক্ষেপে এই রকম:

১. ১৯৮৫ সালে শ্রমিকদের মজুরি কারখানার মোট আয়ের ৪৮%।

২. ১৯৮৫ থেকে ৯০ সালের মধ্যে চলতি দামে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ৭০%। এবং

৩. ঐ সময়ে কারখানার মোট আয় বেড়েছে ১৩১%।

এই তথ্যগুলো থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে:

(ক) সব ধরনের মালিকদের মিলিতভাবে মুনাফা বেড়েছে ১৮৮% এবং

(খ) ১৯৯০ সালে মোট আয়ে শ্রমিকদের অংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫%-এ।

এই ধরনের শিল্প উন্নয়নে পুঁজির মালিকদের অবশ্যই আনন্দিত হওয়ার কথা। এখানে কিন্তু রেজিস্টার্ড কারখানার যে মজুরেরা মাসে ১৬০০ টাকার বেশি মজুরি পান তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তথাকথিত সংগঠিত শিল্পে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম মজুরি পান তাঁদের সম্বন্ধেই ঐ তথ্য। এঁদের অবস্থাও গত ৫ বছরে একইভাবে দ্রুত খারাপ হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা সহজ যে কুটির শিল্প এবং খুব ছোট কারখানা, যাদের রেজিস্ট্রি করতে হয় না, তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও খারাপ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা অবশ্যই কৃষি মজুরদের, যাঁরা আমাদের রাজ্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদনে নিযুক্ত মোট কৃষি ও শিল্প মজুরদের ৮৪%। সরকারি হিসেবেই একর পিছু ৬৫ জন-দিনের কাজ ধরে ১৯৯০ সালে আমাদের রাজ্যের কৃষিকর্মীরা গড়ে বছরে বড় জোর ১২০ দিন কাজ পেয়েছেন চাষের জমিতে। আরও ৫০ দিন যদি তাঁরা একই মজুরিতে অন্য কাজ পেয়েও থাকেন, তাহলেও তাঁরা চলতি দামে মজুর পিছু মজুরি পেয়েছেন বছরে ৩৬৬০ টাকারও কম। এটা শিল্প শ্রমিকদের গড় বার্ষিক মজুরির (১৪০০৯ টাকার) মাত্র ২৬%।

মাসে ১৬০০ টাকা বা তার কম মজুরির শ্রমিকদের চলতি দামে যখন মজুরি বেড়েছে ১৫.৮% তখন একই সময়ে ঐ চলতি দামে রেজিস্টার্ড কারখানাগুলির মোট আয় বেড়েছে ২০৬৯ কোটি টাকা থেকে ৪৭৮২ কোটি টাকা বা ১৩১%।

সবরকম বেতনের মজুরদের মিলিতভাবে গড় মজুরি কত সে সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় গত ৫ বছরে চলতি মূল্যে এই আয় বেড়েছে মোটামুটি ৬০ থেকে ৭০%। অর্থাৎ কারখানাগুলির মোট আয় যে হারে বেড়েছে প্রায় তার অর্ধেক হারে বেড়েছে মজুরদের আয়। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে মালিক ব্যবসাদারদের আয় বেড়েছে অনেক বেশি দ্রুত হারে, পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত শিল্পে। এর আগের পাঁচ বছর (১৯৮০-৮৫) যখন ঐ শিল্পে উৎপাদন প্রায় স্থানু ছিল [পাঁচ বছরে ২.১% বৃদ্ধি] তখনকার হিসেব থেকে মনে হয় শিল্পের মোট আয়ে মজুরদের অংশও মোটামুটি স্থানু ছিল। এর থেকে এটা বুঝতে পারা যায়, পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে (১৯৮৫-৯০) যে শিল্প উৎপাদন বেড়েছে তার একটা প্রধান পূর্ব শর্ত ছিল, মজুরদের মজুরিবৃদ্ধিকে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক নিচে রাখা, যাতে মালিক-ব্যবসাদারদের মুনাফা বৃদ্ধির হার, অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি থাকে।

বামফ্রন্ট সরকার এই সমীক্ষায় তথ্য পরিবেশন করার সময়ে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছে যাতে শ্রমিকেরা এবং অন্যরা তাঁদের সত্যিকারের অবস্থা বুঝতে না পারেন। এবং যাতে তাঁরা উল্টো একটা ধারণা করে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে, শান্ত হয়ে, বামফ্রন্টের উপর, সরকারের উপর পুরো নির্ভরশীল থাকতে পারেন।

আত্মনির্ভরশীলতার পথে

এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব। শিল্প শ্রমিকেরা ইচ্ছা করলে, গোটা দেশের না হোক, অন্তত নিজ নিজ কারখানার অবস্থা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এটা নিশ্চয়ই মোটামুটি বুঝে নিতে পারেন: কারখানায় কি কি উৎপাদন কতটা হয়; তার জন্য কি কি কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদান বাইরে থেকে আসে। উৎপাদন মূল্য থেকে মোট উপাদান এবং যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ

খরচ বাদ দিয়ে কারখানায় মোট কত আয় হয়; এই আয়ে শ্রমিকের মজুরির ভাগ কত আর খাজনা সুদ ও মুনাফা বাবদ মালিকদের ভাগ কত ইত্যাদি। সব তথ্য কি শ্রমিকেরা চেষ্টা করলে, নিজেরাই জেনে নিতে পারেন না? একই সঙ্গে জানতে পারা যায়, এই কারখানায় আরও কতটা উৎপাদন হতে পারত। কিন্তু কেন এখন তা মালিকেরা করছে না। যন্ত্রপাতির কিছু পরিবর্তন করে কারখানায় যে সব অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর জিনিষ তৈরি হয় তার পরিবর্তে প্রকৃতির দূষণ না বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জিনিষ কি কি কতটা উৎপাদন করা সম্ভব এবং তা কেন এখন হয় না এবং সর্বোপরি কেবল মালিকদের মুনাফার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালাবার পরিবর্তে যদি শ্রমিকরা নিজেদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটা শ্রমজীবী ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে পারতেন, তবে শ্রমিকদের এবং সমগ্র দেশের কি কি আর কতটা উপকার হত, এবং চলতি পুঁজির মুনাফাভিত্তিক পথের পরিবর্তে ঐ শ্রমজীবী ভিত্তিক পথে দেশকে নিয়ে যেতে হলে শ্রমিকদের এখনই কি কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার?

আসলে এতদিন পর্যন্ত যে শ্রমিক আন্দোলন চলে আসছে, সেখানে শ্রমিকরা যাতে ঐসব কথা না ভাবেন বাস্তবে তার চেষ্টাই হয়েছে। তাই সমগ্র দেশ বা কোন একটা শিল্প সম্বন্ধে দূরের কথা, কোন একটা কারখানার সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধেও সেই কারখানার শ্রমিকরা সচেতন হোন তার কোন ব্যবস্থা ঐ শ্রমিক আন্দোলন এখন পর্যন্ত করেনি। তা করলে নিজ নিজ কারখানার অবস্থার সুষ্ঠু বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের যে নির্দিষ্ট জ্ঞান হত, সেই জ্ঞানকে তাঁরা ব্যবহার করতে পারতেন নেতাদের বক্তব্যকে যাচাই করতে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমিকরা সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারতেন। নেতাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে তাঁরা নিজ নিজ সংগঠনকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারতেন, তাঁরা নিজেরাই সচেতনভাবে নিজেদের নেতৃত্বের প্রধান অংশ হতে পারতেন, একমাত্র তা হলেই শ্রমিকদের দাবার ঘুঁটি করে বিভিন্ন পেশাদার 'নেতা' যে শ্রমিক আন্দোলনের লাভজনক ব্যবসা চালাচ্ছেন তা বন্ধ করে দেওয়া যেত। আর খুব মুষ্টিমেয় যে ক'জন নেতা সত্যিই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মনির্ভর করার আন্দোলনে অংশীদার হতে চান, তাঁদের চেতনা, তাঁদের সক্ষমতা ঐ শ্রমিকরা অনেকখানি বাড়িয়ে দিতে পারতেন। আমাদের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলি সে পথ মাড়ায়নি।

শ্রমিক নির্যাতনের চেহারা

গত দশকে হাজার হাজার মজুর ছাঁটাই হয়েছে। সুষ্ঠু প্রতিবাদ হয়নি। শয়ে শয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং শ্রমিকদের নিরন্ন রেখে বন্ধ বা রুগ্ন করার মাধ্যমেও মালিকদের মুনাফা লুঠ করার কাজ অব্যাহত থেকেছে। এমন কি নিজেদের বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে যেটুকু সুযোগ শ্রমিকরা পেতেন তাও প্রতিবছর কমে চলেছে। শ্রমিকদের উপর কাজের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে। সামান্য মজুরির একটা অংশ দিয়ে মালিকদের পুঁজির যোগান দিতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমিকরা। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা জমা না দিয়ে, ই এস আই-র টাকা জমা না দিয়ে মালিক তা নিয়ে নয়ছয় করছে।

সরকারের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫-র মধ্যে শিল্প উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি না পেলেও ১৯৮৫ সালের টাকার স্থির মূল্যে আয় এবং উৎপাদন দ্রুত বেড়েছে। এই উৎপাদনের সূচক ১৯৮০, ১৯৮৫ এবং ১৯৯০তে ছিল যথাক্রমে ১০০.০, ১০২.১, এবং ১২১.৯। অর্থাৎ ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-র মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে ১৯.৪%। ঠিক একই সময়ে শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে ৮৯২ হাজার থেকে ৮৮১ হাজারে বা প্রায় ১.২%। অর্থাৎ এই সময়ে শ্রমিক পিছু কাজের বোঝা বেড়েছে প্রায় ২১%। একই সঙ্গে টাকার স্থির মূল্যে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের গড় মজুরি কমেছে প্রায় ২৭%। অন্যদেরও ঐ কাজের বোঝা বৃদ্ধির তুলনায় সামান্য আয় বেড়েছে।

ই এস আই থেকে শ্রমিকেরা যে টাকা পান, চলতি মূল্যেই ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯১-৯২ — এই পাঁচ বছরই আগের বছরের তুলনায় কমেছে। এই পাঁচ বছরে এর পরিমাণ হল যথাক্রমে ২৪৩৯, ২০৬২, ১৮৫২, ১৪৭৪ এবং ১৩৪৩ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছরে চলতি মূল্যে কমার হার হচ্ছে ৪৫%।

আর ১৯৬০ সালের দামে এদের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে ৬৩% হারে।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯২, এই পাঁচ বছরে 'লে অফ' করিয়ে ৪১৭৪ জন শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। আর সোজাসুজি ছাঁটাই করা হয়েছে ২০০ জনকে। তাছাড়া এই সময়ে ৭২টি রেজিস্টার্ড কারখানা তাদের ৩,৮২৪ জন মজুরসহ বন্ধ হয়ে গেছে। (অবশ্য একই সময়ে আগের বন্ধ হওয়া ২৭টা কারখানা নাকি খুলেছে, যেখানে আগে ৬,১৫৭ জন কাজ করতেন। এই খোলবার পর এখন সেখানে ক'জন সত্যিই কাজ পেয়েছেন তার স্পষ্ট তথ্য নেই।)

শ্রেণীচেতনা সৃষ্টির পথে

এই সমস্ত অত্যাচারের মোকাবিলা করার পথ ও পদ্ধতি সবসময়ে বা সব জায়গায় একরকম নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে মাত্র এক ধরনের তথ্যই সরকারি পুস্তকে পাওয়া যায়। তা হচ্ছে শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং মালিকদের লক-আউট সম্বন্ধে তথ্য। এই তথ্য আমাদের আগের বছরের পুস্তকেই আলোচনা করা হয়েছিল। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২, এই পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর ২৬টি লক্ষ জন-দিন নষ্ট হয়েছে ধর্মঘট এবং লক-আউটের ফলে। এর মধ্যে লক-আউটে নষ্ট হয়েছে ২৬১.৫ লক্ষ জন-দিন বা মোট নষ্ট জন-দিনের ৯০%। বাকি মাত্র ১০% নষ্ট হয়েছে ধর্মঘটের ফলে। এই ধর্মঘটেও যত দিন নষ্ট হয়েছে তার সিংহভাগ গেছে ১৯৯২ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত ৪৫টি চটকলে সবকটা ট্রেড ইউনিয়ন মিলে যে ধর্মঘট ডেকেছিল তার ফলে।

কারখানা বা চাষের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেই তার মধ্যে শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় না। যখন শ্রমিকরা মালিকের চাতুরি বুঝতে পেরে তা প্রতিহত করতে মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন, তখনই তাঁদের পরিবর্তন সম্ভব।

এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ নিজেদের ও দেশের অবস্থা বুঝতে শুরু করা। এর জন্য সরকারি তথ্যের ব্যবহার শেখা দরকার। তথ্যগুলোর মধ্য থেকে সত্যকে খুঁজে বের করা দরকার। এই অনুসন্ধান সফল হলে গোটা দেশ ও তার বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে শ্রমিকদের সাধারণ ধারণাটা পরিষ্কার হবে।

তথ্যের বিকল্প সূত্র

এই তথ্য অনুসন্ধানের কাজে সবচেয়ে বড় পরিপূরক অংশ হচ্ছে শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট কারখানা, এলাকা ও গ্রামকে জানা এবং বোঝা। প্রতিটি কারখানা বা গ্রাম সম্বন্ধে সরকারি তথ্য নেই; থাকলেও তা বেশ পুরোন। প্রত্যেক শ্রমিকই তাঁদের কারখানা বা গ্রামের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সবকিছু হয়ত জানেন না, কিন্তু প্রয়োজন হলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তা জেনে নেওয়া সম্ভব। এই কাজ রাজ্য ও দেশব্যাপী করা গেলে শ্রমিকশ্রেণীর বিকল্প তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি হবে। উৎপাদনসংক্রান্ত কাজ কনেক কঠিন, তুলনায় সরকারি তথ্য নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে শেখাটা সহজ। অবস্থার পরিবর্তনে শ্রমিকদেরই যোগ্য অংশ নিতে হবে।

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যাঁরা এককালে শ্রমিক সংগ্রাম সংগঠিত করতেন, তাঁদের প্রধান কাজ এখন শ্রমিকদের শান্ত করে সরকারের কাছে পোষ মানিয়ে রাখা এবং সেই প্রয়োজনেই কখনও কখনও শ্রমিকের হয়ে মালিকের সঙ্গে দর কষাকষি করা। তাছাড়া ছাঁটাই আর কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় তো আছেই। সেই ভয়ে শ্রমিকরা এখন বিচ্ছিন্ন, নিজস্ব শ্রেণীসংগঠন প্রায় নেই। তাই তাঁরা সরকারের ওপর, রঙ-বেরঙের নেতাদের ওপর ও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এর সবচেয়ে লজ্জাজনক নজির, গত ৬ই ডিসেম্বরের পর কলকাতার দাঙ্গা। কেশোরামে ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় শ্রমিকরা তাঁদের কারখানার পাশে বস্তির দাঙ্গার নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ঠিক এরকম ছিলেন না কখনও।

এতে কেবল শ্রমিকদের সর্বনাশ নয়, সর্বনাশ গোটা দেশের। তাই আজ বোধহয় শ্রমিকদের আত্মনির্ভরশীল ও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ স্থির করবেন তাঁরা নিজেরাই।

চটশিল্পে চুক্তির (১৭.৩.১৯৯২) কিছু অংশ

চটশিল্পের বেশ কিছু কারখানা শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ পাওনা — প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, ই. এস. আই ইত্যাদির টাকা মেটায়নি। চুক্তিতে বলা হয়েছে :

- ▶ গ্র্যাচুইটি বাবদ আইনত পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নিরাপত্তা দিচ্ছেন মালিকরা।
- ▶ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ই এস আই এবং শ্রমিকদের অন্যান্য প্রাপ্য যেন বাকি না থাকে, মালিকরা সেদিকে নজর রাখবেন।
- ▶ ইতিমধ্যে অবসর নেওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা-গণ্ডা আগামী ছ'মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- ▶ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যাবতীয় বকেয়া পাওনা মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত চটকল চুক্তি ভেঙে মজুরি কম দেয়

কারখানা	কেটে নেওয়া টাকা [মাসে]
১. প্রেমচাঁদ জুট মিলস	৯০০
২. তিরুপতি জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	৮০০
৩. (শ্রী হনুমান জুট মিলস)	৪২৫
৪. অকল্যাণ্ড ইন্টারনেশন (অম্বিকা)	৪৯৫
৫. নর্থব্রুক জুট মিলস	১২৬
৬. কানোরিয়া জুট মিলস (প্রতিদিন)	১২
[চুক্তি অনুসারে মাসিক মজুরি ১৯৫৭ টাকা]	

এক নজরে ভারতীয় পাট ও পাটশিল্প

- পাট চাষ হয় গড়ে ৯৭৭ একর জমিতে।
- কাঁচা পাটের গড় উৎপাদন ৭৭৬১ হাজার বেল।
- চটকলের সংখ্যা ৭৩।
- ১০০% রপ্তানি নির্ভর চটকল (পশ্চিমবঙ্গে) ৪টি।
- সরকারি মালিকানায় ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং করপোরেশনের অধীনে ৪টি কারখানা।
- চটকলগুলিতে তাঁতের সংখ্যা (১.১.৯০) ৪৪,০৪২।
- চটশিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২,৫০,০০০।
- ন্যূনতম মজুরি (এপ্রিল '৯২) মাসে ১,৮৩০ টাকা।
- পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বছরে ১,২৯৫ হাজার টন।
- ভারতের পাটজাত উৎপাদন কেনে ৯২০টি দেশ।
- রপ্তানির গড় পরিমাণ বছরে ২৩৩ হাজার টন বা ২৪৯.৭০ কোটি টাকা।
- দেশের বাজারে চাহিদা বছরে ১,০৭২ হাজার টন।

বন্ধ কলকারখানা

ক্ষুধা, মৃত্যু আর আত্মহনন

'বন্ধ শিল্পসংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের অনেকে অনাহারে মারা গিয়েছেন, এমন কোনও তথ্য তাঁর (শান্তি ঘটকের) কাছে নেই।'

— বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ এপ্রিল ১৯৯৩

● সন্ধে নেমে এসেছে। কোন্নগরের ক্রাইপার রোডের দুধারে দোকানে দোকানে তখন মানুষের ভিড়। শীর্ণ, ন্যুব্জ, ক্লান্ত একজন মানুষ। চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত। মুখ ক্লান্ত, গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। কামানো হয়নি বেশ কিছুদিন। কাঁধে ঝোলানো আইসক্রিমের বাক্স। দিনের শেষে সামান্য রোজগার করে ঘরে ফিরছেন এই মানুষটি। একটা চোখ নষ্ট। মিলে কাজ করতে গিয়ে বেল্টের আঘাতে গলে গেছে চোখটা। অন্য চোখে ছানির ঘন আস্তরণ। দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। ঘরে আছে দুই মেয়ে, দুজনেই পাগল। আর ছিল দুই ছেলে, কয়েকদিনের ব্যবধানে মারা গেছে দুজনেই। সারাদিন বাক্স কাঁধে ঘুরে আইসক্রিম বিক্রি করে পেট চালানোর চেষ্টা করেন শ্রীদুর্গা কটন মিলের শ্রমিক রাখাল সেন। মিলটি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৮৬ সালে। সারাজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় রাগী এখন ইনি। কথা বলতেই তিনি বলে ওঠেন, 'ঠিকানাটা লিখে নাও। জানিয়ে দেবেন সকলকে।' ইউনিয়নের নেতাদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'কোন নেতা-ফেতাদের বাড়ি আমি চিনি না।'

● বালি জুট মিলের রবিন চ্যাটার্জি আত্মহত্যা করেছেন লাইনে গলা দিয়ে। গত ৩রা এপ্রিল। মাত্র বারো দিন আগের কথা। কারখানাটি বন্ধ আছে গত বছরের অগস্ট মাস থেকে। ইনি ছিলেন মিলের হাজিরাবাবু। মাঝে মাঝেই বন্ধ হয় মিল, হাজারো দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত রবিনবাবু বিকল্প পথের সন্ধান করতে পারেন নি। অন্য কোন ধরনের কাজ করতে তাঁর সম্মানে বেঁধেছে। টাকার উৎস শুকিয়ে যাওয়ায় ক্রমশ তাঁদের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। ছোট ছেলে এবং ২২ বছরের মেয়ের বিয়ের চিন্তায় ক্লিষ্ট এই মানুষটি শেষ পর্যন্ত লাইনে মাথা পেতে দিয়েছেন রাত ৯.২৫ নাগাদ। তাঁর স্ত্রী জানান, 'কী করবে! নইলে সুইসাইডকে খুব ঘেন্না করত'। আর সদ্য পিতৃহারা ১৭ বছরের ছেলে বলে, 'ভিক্ষা তো করতে পারে না, স্ট্যাটাস আছে আমাদের।'

● আগরপাড়া বাসন্তী কটন মিলের কুলি লাইন। সরু রাস্তার দু-পাশে সারি সারি ভাঙাচোরা ঘর। বেশির ভাগ ঘরেরই দরজা-জানলা ভাঙা। দিনের বেলাতেই অন্ধকার। ছেঁড়া নোংরা পর্দা টাঙানো। এক চিলতে জায়গা, বোধহয় বারান্দা। পর্দার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলেন একটি বিধবা মেয়ে। বছর আটাশ বয়স, পরনে আধময়লা শাড়ি। সাগ্রহে ডাকলেন ঘরে। ঘরে আছে একটা চৌকি আর একটা ট্রাঙ্ক। স্বামীর মৃতদেহের ছবি টাঙানো আছে দেওয়ালে আর তাতে জন্ম মৃত্যু সাল লেখা গোটা গোটা অক্ষরে। আছে একটা ভাঙা চেয়ার আর ছোট টুল। তাঁর নাম রত্না নাগ। স্বামী বিশ্বনাথ নাগ ১৯৯০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মারা গেছেন। জণ্ডিস হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল টিবি। তখন তাঁর বয়স ৩৬। এখন আছে দুই ছেলে, ছোটজন পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, বড় জন পঞ্চমে। রত্নাও পড়েছিলেন সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড আছে, ডাক মেলে না। ঠোঙা বানিয়ে এবং একটি বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনার কাজ করে তাঁর মাসিক আয় ২৫০ টাকা। বাড়ি

ভাড়ার টাকা নেই বলে তাঁরা বছর চারেক আগে এসেছেন কুলি লাইনে। বাসন্তী কটন মিল বন্ধ হয় ১৯৮৯ সালে। তরকারি বিক্রি করে পেট চালাতেন বিশ্বনাথবাবু।

● সুলেখায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি সকালে হাফ ছুটি আর দুটো করে কমলালেবু উপহার পেতেন শ্রমিকরা। তারপর তাঁরা মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নিতেন ভালো করে কারখানা চালাবার। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তালা ঝুলেছে সুলেখায়। পুরো ছুটি। আর খোলেনি।

● বছর তিনেক আগের ঘটনা। বজবজ জুট মিলের বন্ধ গেট। সামনে কুলি লাইন। সারি সারি মুখোমুখি ঘর। তারই একটা ঘরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। একমাস পরে দিন স্থির হয়েছে। গোলাম মল্লিক নিশ্চিন্ত। তিনি ঐ মিলের স্যাকসুইয়িং বিভাগের শ্রমিক। কিন্তু হঠাৎ কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর সব টাকা আটকে যায়। পণ ও বিয়ের খরচের টাকা যোগাড় হয় না। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন গোলাম মল্লিক।

● রাস্তার বাঁ হাতে একটি ঝকঝকে মসজিদ। তার গায়ে মুসলমান কুলি লাইন। ডানহাতে মেথরদের থাকবার জায়গা। বিশাল চত্বর। আরও অনেক কুলি লাইন, বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তারই একাংশ ভেঙে তৈরি হয়েছে সিটু অফিস। আর তৈরি হচ্ছে আই এন টি ইউ সি অফিস। ছবিটি নৈহাটির গৌরীপুর জুট মিলের। খুলেছে ১৯৯০ সালে। একটি ইউনিট খুললেও অন্য একটি ইউনিট বন্ধই। বন্ধ ইউনিটের মেশিন বিক্রি হয়ে গেছে। শেড ভেঙে-চুরে সাফ। দু-চারটে ইট ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। বন্ধ ইউনিটের শ্রমিকদের কিন্তু চালু ইউনিটে কাজ দেওয়া হয় নি।

★

পশ্চিমবঙ্গে বড়-মাঝারি ও ছোট মিলিয়ে ৫৩,৭০০ কারখানা বন্ধ। রাজ্যে বড় ও মাঝারি কারখানা ২২,০০০। তার মধ্যে বন্ধ হয়েছে ৩০০০। বাকিগুলো ছোট। বিদ্যুতের ব্যবহার থাকলে অন্তত ১২ জন শ্রমিক নিয়ে তৈরি হয় একটা কারখানা; আর বিদ্যুৎ না থাকলে ২০ জনে সেটা হতে পারে। আর এমন কারখানার সংখ্যাই ১২০০০। এগুলো দেখাশোনা করার জন্য আছেন ৪০ জন সরকারি ইন্সপেক্টর। কিন্তু বাকি কারখানাগুলো দেখাশোনা করার জন্য কাউকে বহাল করা হয়নি। আর তাই বোধহয় শ্রমমন্ত্রীর কানে কোন মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছয় না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলকারখানায় ঘুরে ঘুরে সমীক্ষা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই শুনতে হয় মৃত্যুর খবর। সে খবর জানার জন্য খুব যে কষ্ট করতে হয়, এমনও নয়। বলাই বাহুল্য মৃত্যুর মূল কারণ, অনাহার। আর তার ফলে অসুখ এবং কখনও কখনও মৃত্যু স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ আত্মহত্যা। প্রতিনিয়তই শুনতে হয়, 'বাবু, আমরা শ্রমিক নাই, নালির পোকা আছে।' আর তাইজন্যই কি শ্রমমন্ত্রী বধির?

আসানসোল-রানীগঞ্জ, আগরপাড়া-শ্যামনগর-নৈহাটি, কোন্নগর-লিলুয়া-বেলুড় অথবা বজবজ যে-দিকেই যাওয়া যাক, ছবিটা কিন্তু একই। আটের দশক যেন কারখানা-বন্ধের দশক। বড় বড় কারখানাগুলো এখন আগাছায় ভরা, দেওয়ালগুলো নোনা-ধরা, কারখানার সাইনবোর্ডটা টিঁকে আছে কোনরকমে। বিধ্বস্ত কারখানায় অবশ্য প্রহরী আছে। কারণ ভেতরে যে যন্ত্রপাতি আছে, তা পাহারা দিতে হবে তো। এ এক নির্লজ্জ পরিহাস।

আসানসোলের হিন্দুস্থান পিলকিংটন কাচ কারখানার ঠিক এরকমই ভগ্ন দশা। ১৩ বছর যাবৎ বন্ধ এই কারখানায় বেশ কিছু প্রহরী অত্যন্ত সতর্কভাবে রয়েছে সর্বক্ষণ। বড় রাস্তার বাঁ হাতে বিশাল এই কারখানা, ডানদিকে একটু ভেতরের দিকে মিনিট পাঁচ-ছয় হেঁটে গেলেই মজদুর লাইন। ১১০টা কোয়ার্টার আছে এখানে, স্টাফ কোয়ার্টারের সংখ্যা ১৫। অন্ধকার সব ঘর, কারণ কারখানা বন্ধ হওয়ায় বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। জলের কল নেই, গাড়ি করে এসে জল দেয় পুরসভা। অনেকেই জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছেন। ফলে অনেক ঘরই এখন সমাজবিরোধীদের আখড়া। তবুও কাচ কারখানার কিছু কিছু কর্মী আছেন এখনও ওই ঘরগুলোতে, কারণ তাঁরা নিরুপায়, ছিন্নমূল। কেউ ধূপ, কেউ চানাচুর, কেউ লটারির টিকিট বিক্রি করেন, কেউ

বা কাপড়ের ছোটখাটো ব্যবসা করেন। ওয়ার্কশপের কর্মী দীননাথ রজক এখন কুলি লাইনের কাছে ধোপার কাজ করে কোনরকমে পেট চালাচ্ছেন। অনেকে কাজ করেন খাদানে ১৫/১৬ টাকা রোজে। কারখানায় বাঙালি, বিহারি এবং উত্তরপ্রদেশীয় — সবরকম শ্রমিকই ছিলেন। ফলে এই মজদুর লাইনেও এরা আছেন মিলেমিশেই। চিত্তরঞ্জন পাণিগ্রাহী ২৫ বছর ঐ কারখানায় চাকরি করার পর এখন পেট চালানোর জন্য লটারির টিকিট বিক্রি করেন এবং নাইটগার্ডের কাজ করেন। পরিবারের চারজনের পেট এতে তেমন করে ভরে না। সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে বেকার। তিনি একটা ছোট ব্যবসা করেন। উত্তরপ্রদেশের মানুষ বালিয়ার কোন কাজ নেই। দেশ থেকে মা যা সামান্য পাঠান তাতেই কোনরকমে টিকে থাকা। অনাহার আর অসুখে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যু হয়েছে নিতাই চক্রবর্তীর। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ছেলে পড়ে কলেজে। কিন্তু আয়ের কোন উপায় নেই তাদের সামনে।

আগরপাড়ার ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ বন্ধ হয়েছে ১৯৮০ সালে। ওখানকার লোকের মুখের ভাষায় এটা 'হ্যারিকেন কারখানা'। দীপ্তি হ্যারিকেন আর নূতন স্টোভ তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছিল এই কারখানাটি। ৬০০ শ্রমিক কাজ করতেন এখানে। এখন এখানে জঙ্গলের রাজত্ব। কারখানার দেওয়ালে ক্ষয়ের চেহারা প্রকট। গেটের সামনে দু-চারজন লোক বসে থাকেন প্রায় সময়। তারা কারখানারই প্রাক্তন শ্রমিক। ঐঁদের মধ্যে দু-চারজন রিক্সা চালান আর অবসর সময়ে কারখানার গেটে এসে বসেন। প্রশ্ন করলে বলেন, 'কি হবে জেনে?' কারখানার গায়ে খাওয়ার হোটেল করেছেন মানিক চৌধুরি। তিনিও এই কারখানারই শ্রমিক ছিলেন। স্ত্রী-ছেলেমেয়ের মুখে কোনরকমে ভাতটুকু দিতে পারছেন। হাসিখুশি এই মানুষটি এবং তাঁর স্ত্রী অনর্গল বলে যেতে পারেন কারখানার শ্রমিকদের খবর। মুখে মুখে বলে গেলেন মারা গেছেন এমন দশজন শ্রমিকের নাম। তিনজন শ্রমিক পাগল হয়ে গেছেন। তাঁরা প্রায়শই ঘুরে বেড়ান কারখানার আশেপাশে। বললেন, 'আরও অনেক আছে বাবু, রাতে শুলেই তাদের নাম মনে পড়বে।' তাঁর মতে মৃতের সংখ্যা '৭০ তো হবেই'। 'কী হয়েছিল ঐঁদের?' 'কি আবার হবে! কারখানা বন্ধ। খাবার নেই। অসুখ চেপে ধরেছে। ওষুধ-পথ্যির অভাব'।

শ্যামনগরের কারখানা ডানবারের কুলি লাইন আর কোন্নগরের শ্রী দুর্গা কটন মিলসের টালি লাইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বজবজ জুট মিল কিংবা আগড়পাড়ার বাসন্তী কারখানার কুলি লাইনও তথৈবচ। ছোট ছোট একফালি ঘর। গোটা চত্বরে জল নেই। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। দরজা-জানলা ভাঙা। কোন কোন ঘর পরিত্যক্ত। শ্রমিকরা বিকল্পের সন্ধানে ছড়িয়ে গেছেন নানা জায়গায়। বাথরুম-পায়খানার অবস্থা সাংঘাতিক, বলাই বাহুল্য। শ্রীদুর্গায় ৪০ টা ঘর, ডানবারের ৫০০ ঘর, বজবজের ২৫০ জন মানুষ যাই হোক না কেন, পায়খানা তাদের একটাই। স্নানের তেমন কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। তাঁরা দিন কাটান ভয়ে ভয়ে। কারণ ঘরগুলির ভগ্ন দশা; যে-কোন মুহূর্তেই ভেঙে পড়তে পারে মাথার ওপর। ঘরগুলি নিচু, অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকার; ঘরের সামনে নর্দমা। মশা-মাছির দাপটে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারই মধ্যে ডানবার কুলি লাইনে একজন মহিলা ছোট একটা চায়ের দোকান করেছেন। তাছাড়াও আছে একটা ছোট মুদি দোকান। ঐঁরা প্রত্যেকে কারখানারই শ্রমিক। আর প্রত্যেক কুলি-লাইন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য, রাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। শ্রমিকরাই জানান এ-তথ্য। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়। বাধ্য হয়েই এদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেন ঐঁরা। কারণ অনাহারে ও অসুখেও ঐঁদের বাঁচার ইচ্ছে প্রবল। ঘরের মেয়েদের কাজে নামতে হয়েছে কারখানা বন্ধের পর। কেউ ঠিকে ঝিয়ের কাজ করেন, কেউ কয়লা বাছাই করে রোজগার করেন, কেউ পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ছেলেরা যে-সব কাজ করে সেগুলি কিছুটা অনিয়মিত বলে এদের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে; 'বাড়ির মেয়েছেলেদের কাজে নামাতে হয়েছে বাবু! পেট তো কথা শোনে না।' কেউ হয়ত বা কলকাতায় যান আয়া বা ঝিয়ের কাজ করতে, ঘরে ফেরেন রাতে। এই শ্রমিকদের কেউ কাজ করেন যোগাড়ের, কেউ ফেরিওয়ালা, কেউ লটারির টিকিট বিক্রি করেন। কেউ দিনমজুর, কেউ

রিক্সা চালান, কেউ হকার, কেউ বা ভিখিরি। ১৯৯২ সালের দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই ডানবারে হয়েছিল ভয়ংকর কলেরা। ডানবারের ৪ নম্বর কুলি লাইনের প্রায় প্রতি ঘরেরই মানুষকে ঘুরে আসতে হয়েছে হাসপাতালে। একদিনে হাসপাতালে গিয়েছিল ১৭৫ জন। অনেকেই আর ঘরে ফিরে আসেন নি। কলেরার প্রকোপ বেশি হয়েছিল 'ম্যাড্রাসি লাইনে'। এখানে দক্ষিণ ভারতের অনেকেই কাজ করতেন। মাস চারেক আগে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ভারতের মানুষ শোলাপুরির। তাঁর স্ত্রী গোবিন্দ আম্মার বয়স ৪৫ হলেও মনে হয় তিনি যেন ৭০ বছরের বৃদ্ধা। দুই মেয়ে — বড় জন বৃদ্ধমতী এবং ছোটজন শকুন্তলা। অপুষ্টির ফলে এদের বয়স অনুমান করা কঠিন। অন্য আরেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে শোলাপুরির গ্র্যাচুয়িটির টাকায়। এঁর স্ত্রী ঝি-গিরি করে অন্ন সংস্থান করেন। জগদীশ্বর এবং তার জামাইবাবু জঙ্গবাহাদুর দুজনেই ডানবারের শ্রমিক। জঙ্গবাহাদুর পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন গলায় দড়ি দিয়ে। অসুস্থ জগদীশ খাটিয়ায় বসে থাকেন দিন রাত আর তাঁর স্ত্রী কলকাতায় গিয়ে এক মাড়োয়ারির বাড়িতে বাচ্চার দেখাশোনা করেন। মার্চ মাসে মারা গেছেন শুকদেও সিং। কারণ অনাহার।

সুলেখার কর্মী নিতাই সাহা চাল বিক্রি করেন। সংসারে আছে চারমেয়ে, স্ত্রী এবং মা। একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কোনরকমে। বন্ধের সময় তাঁর মাইনে ছিল ৮০০ টাকা। ফলে তাঁকে অন্য কাজও করতে হত। জমি ভরাট করার জন্য মাটি ফেলে তাঁর রোজগার হত আরও কিছু। তাঁর কাছে জানা গেল, কারখানার শতকরা ১০ জন কোনরকমে বেঁচে আছেন, আর ৯০ জনই লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে। এই ভালো থাকা ১০ জন তাঁদের আশে-পাশে থাকা মৃত্যুমুখি শ্রমিকদের সাহায্য করেন সাধ্যমতো। 'কী ধরনের কাজ করেন?' 'আমরা, এই তো! কেউ ঠাকুরের কাজে যোগাড়ে, কেউ রাজমিস্ত্রির যোগাড়ে, কেউ রিক্সা টানে।' বিপিন মণ্ডল এবং বাদল দেব অনাহারে মারা গেছেন। তাঁরা বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও করতে পারেন নি। ১৯৯০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া অশোক স্টিল কর্পোরেশন লিমিটেড-এর ভোলা শেঠ মারা গেছেন ১৯৯২ সালে। গ্যাস দিয়ে লোহা কাটার কাজ করতেন তিনি। অনাহার আর রোদে বসে কাজ করতে হত বলে মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি থাকেন মুসুল্লিতে। ঐ কারখানারই একজন কর্মী রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে পানের দোকান করছেন।

শ্রী দুর্গা কটন মিলের ৪০ ঘরের মধ্যে বর্তমানে আছে ৩৮ ঘর। প্রত্যেক পরিবারের সদস্যসংখ্যা অন্তত আট। এরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। এদের এক টুকরো নিজস্ব জমি নেই। কোন্নগর রেলস্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। বড় বড় বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঢুকতে হয় এই টালি লাইনে। বোঝা যায় না, ঐ অট্টালিকাগুলোর পেছনে রয়েছে এই ছন্নছাড়া, ছিন্নমূল গৃহস্থালি। এঁরা চিন্তিত, আবার কবে উদ্বাস্তু হবেন সেই নিয়ে। জমিটুকু গেলে তাঁরা ভিখিরিতে পরিণত হবেন। কারণ 'দাশ' বলে তাঁদের কিছু নেই। এখন দু-মুঠো অন্নের সংস্থান হচ্ছে তবু। কিন্তু জমির চিন্তায় এঁরা দিশেহারা। এই লাইনেই অনাহারে মারা গেছেন কমপক্ষে দশজন, তিনজন আত্মহত্যা করেছেন দুশ্চিন্তায়। নিখিলচন্দ্র দের দুই ছেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সামান্য রোজগার করেন। এঁদের বয়স ৫০ বা তার সামান্য বেশি। কিন্তু সকলেই অকালবৃদ্ধ। গলির মোড়ে পানের দোকান আছে যতীনচন্দ্র দের। রাগী মানুষ, একটু যেন খ্যাপাটে। তিনিও এই কটন মিলেরই শ্রমিক। তার ভাষায়, দোকানটিরও এখন 'মিলেরই দশা'।

পঞ্চাশোর্ত্তীর্ণ শান্তি চক্রবর্তী ১৯৮৬ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সুলেখার কর্মী। তিনি পুরোপুরি পথের ভিখিরি। সংসারে আছে স্ত্রী ও ছোট একটি ছেলে। থাকার ঘরও জোটে না। অন্যের দয়ায় কোনরকমে পেট চলে তাঁর। অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকেন বলে তাঁর ঠিকানা হাসপাতাল। ওষুধ এনে দেন বন্ধুবান্ধব। অনাহারে অসুস্থতা ক্রমবর্ধমান। ১৯৯১ সালে বন্ধ হয়েছে বেলুড়ের সুর আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড। অনেক জিনিস তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে, শ্রমিকদের সংগঠিত চেষ্টায় মালিক সেগুলো বিক্রি করতে পারেন নি। কারখানা চত্বরেই মালিকের বড় বাড়ি এবং ঐ চত্বরেই অন্য কোম্পানিকে একটা অংশ ভাড়া দিয়েছেন। তিনি নিজেও সেখানে যুক্ত।

এছাড়া এদের কারখানা আছে কলকাতাতেও। এই কারখানা আসলে একটা হলেও কাগজে-কলমে তিনটে -- লিলুয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, রবিন শেয়ারিং এবং স্ট্যাণ্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রয়োজনে সাইনবোর্ডগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগানো হত। একই সাইনবোর্ডের দুপিঠে দুটো নাম লেখা রয়েছে। কারখানার কয়েকজন শ্রমিক এখন সকালবেলা পেটে চালানোর জন্য তরকারি বিক্রি করেন।

কয়েকবার খোলা বন্ধের পর ১৯৯২ সালের অগস্ট মাস থেকে বন্ধ বালি জুট মিল। এটির কুলি লাইন বেশ বড়। মোট ৪১ টা বাড়ি। দোতলা এবং তিনতলা। এক একতলায় দশটা করে ঘর। প্রত্যেক তলায় আছে বাথরুম এবং জলের ব্যবস্থা। রাস্তাঘাটও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ অবাঙালি। এখনও এই লাইন সেই ভয়ংকর দুর্দশার মধ্যে পড়ে নি। হপ্তাবাজারের মধ্যে দিয়ে এসে ঢুকতে হয় এখানে। 'হপ্তা-পেমেন্ট'-এর পর শ্রমিকরা এখানে বাজার করতেন বলেই এ-বাজারের নামও হপ্তাবাজার। লাইনের মধ্যে দু-একজন কিছু কিছু জিনিস বিক্রি করছেন। কোন কোন ঘর তালাবন্ধ। তাঁরা চলে গেছেন বিকল্পের সন্ধানে।

শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালিদের তুলনায় উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মানুষের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ বাঙালিদের মৃত্যুর দিকে দ্রুত ঠেলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। যে-কোন ধরনের কাজ করতে আগ্রহী না হওয়ার ফলে ভয়ংকর রকম বিধ্বস্ত তাঁরা। দেশ-গাঁ বলে কিছু নেই, জমি-জায়গাও নেই তাঁদের। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শিল্পে যেভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে এ-দেশ এবং শ্রমিকদের অবস্থা যেভাবে অসহায় হয়ে যাচ্ছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে ঢাকা, সে-কথা সহজেই বলা যায়। অথচ কারখানাগুলো যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থাভাব নয়। আসলে কারখানা চালানোর চেয়ে বন্ধ করে দেওয়াতেই লাভ বেশি মনে করলে কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন মালিক। অন্যদিকে অধিকাংশ কারখানার ইউনিয়নের নেতারা এক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন না। কখনও কখনও তাঁরাও মালিকের সঙ্গে বন্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। আর বন্ধের ওপর তাঁরা শ্রমিকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন; কোন খবর রাখারও তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। এমনই একটি কারখানা 'অশোক স্টিল কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর মজদুর ইউনিয়নের এক জবরদস্ত নেতা বলেন, 'কারখানা কে বাড়ে মে মজদুরলোগ কুছ নেহি সমঝতে।' কারখানার ভালো-মন্দ সবকিছু বোঝার কথা তাঁদেরই। কারণ নেতাগিরিই তাঁদের 'রুজি-রুটি'।

বন্ধ কারখানার বিপুল শ্রমশক্তির এই যে অপচয়, এর কী জবাব দেবে সরকার? এই যে কর্মহীনতা অথবা কাজ শিখেও সেটা ব্যবহার করতে পারার সুযোগ না পাওয়া, এর জন্য দায়ী কে?

২২ টা বন্ধ কারখানায় ৭৫ জনের আত্মহত্যা

কারখানার নাম	*আত্মহত্যার সংখ্যা*
১. ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ	২
২. বঙ্গোদয় কটন মিল	২
৩. অ্যালুমিনিয়ম ম্যানু কোং	৩
৪. ডানবার কটন মিল	৮
৫. শ্রীদুর্গা কটন অ্যাণ্ড উইনিং মিল	৬
৬. অরবিন্দ বেনেলি লি.	১
৭. হিন্দুস্থান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল	১
৮. সুলেখা	৪
৯. ওপেক স্ট্যাণ্ডার্ড	৩

১০.	জে কে স্টিল	১
১১.	বজবজ জুট কোং	১৩
১২.	হিন্দুস্থান পিলকিনটন গ্লাস ওয়ার্কস	১২
১৩.	বেপি ইঞ্জিনিয়ারিং	৩
১৪.	মেটাল বক্স	১
১৫.	টিটাগড় পেপার মিল	১
১৬.	ইস্টার্ন স্পিনিং মিল	২
১৭.	কোলে বিস্কুট	১
১৮.	বেঙ্গল ল্যাম্প	১
১৯.	ন্যাশনাল ট্যানারি	১
২০.	বালি জুট মিল	২
২১.	ইস্টার্ন পেপার মিল	১
২২.	ইণ্ডিয়া রাবার	৬
		৭৫

৩২ টি কারখানায় বন্ধ থাকাকালীন অচলাবস্থায় ১৫৬০ জনের মৃত্যু

কারখানার নাম	কবে থেকে বন্ধ	মৃতের সংখ্যা (১৫.৪.৯৩ পর্যন্ত)
১. শ্রী দুর্গা কটন অ্যাণ্ড উইনিং মিল	১৯৮৬	৭৫
২. ডানবার কটন মিল	১৯৮৭	১৬৩
৩. ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ	১৯৮৩	২৯
৪. অ্যালুমিনিয়ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	১৯৮৪	৩১
৫. হিন্দুস্থান পিলকিনটন গ্লাস	১৯৮৩	১৬১
৬. সুলেখা (যাদবপুর ও সোদপুর)	১৯৮৯	১৩
৭. বজবজ জুট কোম্পানি	১৯৮৯	৪১৭
৮. ওপেক স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্	১৯৯১	১৭
৯. বাসন্তী কটন মিলস্	১৯৮৯	১৪
১০. মেটাল বক্স	১৯৮৭	৬২
১১. কোলে বিস্কিট	১৯৮০	৫২
১২. বালি জুট মিল	১৯৯২	১৫
১৩. ইস্টার্ন পেপার মিল (কিছুদিন হল আংশিক খুলেছে)		১৩
১৪. ক্রাউন অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি	১৯৮৫	৭
১৫. অশোক স্টিল কর্পোরেশন লিমিটেড	১৯৯০	১
১৬. ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফেকচারিং	১৯৮৪	৭৮
১৭. ন্যাশনাল স্ক্রু অ্যাণ্ড ওয়্যার প্রোডাক্ট লিমিটেড	১৯৮৩	২৪
১৮. হিন্দুস্থান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল	১৯৯০	২০
১৯. কনটেনার অ্যাণ্ড ক্যাপস (ক্লোজার)	১৯৮৩ ও ৮৯ (দুবার)	৬৫
২০. জে কে স্টিল	১৯৮৬	৭৫

২১.	টিটাগড় পেপার মিল	১৯৮৬	১৪
২২.	বঙ্গোদয় কটন মিল	১৯৮৪	১৩
২৩.	অরবিন্দ বেনেলি লিমিটেড	১৯৮৬	৪
২৪.	বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৭৯-৮৩ ও ১৯৮৭ (দুবার)	১১২
২৫.	ভিগান ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৮৫	৯
২৬.	বি. এন. টি. মিলস্	১৯৮৩	২৯
২৭.	পাইওনিয়ার ভিনিয়ার প্রা. লি.	১৯৯০	৪
২৮.	টেক্সটাইল প্রসেসিং কর্পোরেশন	১৯৮৯	২
২৯.	ক্যালকাটা স্টিল	...	২
৩০.	বেঙ্গল ল্যাম্প	১৯৮৯	১৯
৩১.	ন্যাশনাল ট্যানারি	১৯৯১	৮
৩২.	মোটর মেশিনারিজ	১৯৮৫	১২
			১৫৬০

গত বছরের এই প্রতিবেদনে ২৯ টি কারখানায় মৃত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫৩২। এর মধ্যে সামান্য কিছুদিন যাবৎ ৬ টি কারখানা খুলেছে। এই ৬ টি কারখানায় বন্ধ থাকাকালীন মৃত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৭৯। এ-বারের তালিকার সঙ্গে ১৭৯ সংখ্যাটি যুক্ত করলে সংখ্যাটা অনেকটা বাড়বে। এ তালিকাও অসম্পূর্ণ, অনেক মৃত্যু সংবাদই হয়তো আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

ন্যূনতম মজুরি

গভীর হতাশার ছবি

▶ একটা র‍্যাকের গায়ে নমিতা ঝুলিয়ে দেয় সার সার অর্ধেক-তৈরি হওয়া বাল্ব। রেগুলেটরের চাকা ঘোরাতেই জ্বলে ওঠে বাল্বগুলো। আলো বাড়ে, আলো কমে। টেস্টিং হয়ে গেলে পরীক্ষিত বাল্বগুলো দ্রুত হাতে নামিয়ে রেখে র‍্যাকের গায়ে হুকগুলোয় টাঙিয়ে দেয় আরও এক ঝাঁক বাল্ব। ২৪০ ভোল্টের তীব্র তাপ আর ঝাঁঝালো আলোর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে কিশোরী নমিতা সকাল আটটা থেকে সন্ধে আটটা। এই তুমুল দক্ষতা বাবদ পূর্ব-কলকাতার বাল্ব কারখানার কর্মী এই মেয়েটির প্রাপ্য মাসে সাড়ে চারশো টাকা। ন্যূনতম মজুরির হিসেব তার জানা নেই। হদিশ জানে না কোনও ইউনিয়নের। নমিতার মজুরি হিসেব ফুরনে। তাই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার তোয়াক্কা না করেই তাকে কাজ করতে হয় তাড়াহুড়োয়। নমিতা অবলীলায় বলতে পারে, এখনও তো কিছু ঘটেনি। আর আস্তে কাজ করলে নিজেরই লোকসান।

▶ কলকাতার শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া শিল্প, তারের জাল তৈরির কারখানার শ্রমিক নিমাই মণ্ডল। গত ৫৫ বছর ধরে এই কাজে। শীর্ণকায় এবং অপুষ্ট (প্রবীণ) ঐ শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করতে ঢুকেছেন তাঁর কৈশোরে। তারের জালে ফুরনের কাজ। মজুরিও দরের কাজের হিসেবে। ন্যূনতম মজুরি? সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি এই শিল্পে বলবৎ নয়। কারণ ন্যূনতম সরকারি তালিকায় এই শিল্পের ঠাঁই হয়নি। মজুরি হয় ইউনিয়নের সঙ্গে মালিকের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক। তবে দ্রুত কমে আসছে হাতে কাজ। কারণ বেচপ কেঠো তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন উচ্চ কারিগরির ছিমছাম মেশিন।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অসংগঠিত শিল্পের মতো তারের জাল তৈরির কাজটিও সরকারের ন্যূনতম মজুরির তালিকায় ঠাঁই না পেলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৫৬ টি কাজকে সরকার তালিকাভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে ৩৮ টি কাজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে দিয়েছেন সরকার। অর্থাৎ বাকি পড়ে আছে এখনও তালিকার ১৮ টি কাজ। কিন্তু খোঁজ খবর করে দেখা গেছে সরকারি হারে ন্যূনতম মজুরি কোনও মালিক দিচ্ছে কি দিচ্ছে না তা নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা নেই সরকারের। অসংগঠিত এই ক্ষেত্রগুলিতে অনেক জায়গাতেই শ্রমিকরা যেহেতু তেমন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মজুরি আদায়ের জন্য দাবি দাওয়া তুলতে পারেন না, ফলে ন্যূনতম মজুরি আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে মালিকরা দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। না আছে কাজের সময়ের বালাই, না আছে ছুটিছাটার নিয়ম নীতি, না আছে শ্রমিক-স্বাস্থ্য বা শ্রমিক-কল্যাণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা। এহ বাহ্য, ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সরকারি তরফেও গাফিলতি অপরিসীম। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' পুস্তকের সরকারি হিসেবেই দেখা যাচ্ছে ১৯৮৫ সালের পর থেকে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি সংস্কারের সময় করে উঠতে পারেনি। অথচ সরকারি কানুন মোতাবেক ওই সংস্কার অবশ্যই পাঁচ বছর অন্তর করতে হবে। কিন্তু বেশ কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রেই ১৫/২০ বছরের মধ্যে কোনও রকম সংস্কার হয়নি ন্যূনতম মজুরির।

ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে কতকগুলো জরুরি প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রেই

ছোট ছোট শিল্প মালিকরা আইন মেনে ন্যূনতম মজুরি দিতে গেলে তাঁকে স্রেফ ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় মজুরদের সঙ্গে মালিক নিজেও সমানে কাজ করে চলেছেন গায়ে গতরে। বিশেষত ঐতিহ্যানুসারী মুদ্রণ শিল্পে, ছোট প্রেসগুলোতে রয়েছে এই ধরনের সমস্যা। সমস্যা আরও আছে -- এই ধরনের অসংগঠিত কাজে প্রায়শই শ্রমিকদের কোনও ইউনিয়ন নেই। যাও দুবলা পাতলা একটা সংগঠন আছে তার পক্ষে একটা জোরদার আন্দোলন করাও সবসময় সম্ভব হয় না। আবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম কিছু জটিলতাও শ্রমিকদের অসহায় একটা পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশ। ঐতিহ্যানুসারী শিল্পের ক্ষুদে ইউনিটগুলো অনেক সময়েই আধুনিকতার বাজারে হালে পানি পাচ্ছে না। খাবি খেতে খেতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একদিন। এক্ষেত্রে একটা নমুনা খুবই সুপ্রযুক্ত। কলকাতার চামড়া শিল্পের প্রধান বাজারটা ছিল সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে। কিন্তু কে জানত হঠাৎ করে সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর এই হাল হবে আর তার ফলে ডুবতে বসবে কলকাতার চামড়া শিল্প। বস্তুত রপ্তানির অর্ডার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তালা ঝোলাতে হয়েছে বেশ কয়েকটি কারখানাকে। আর এই মন্দার বাজারে কিছু ফড়ে জুটে গেছে তপসিয়া আর ট্যাংরার চীনা পাড়ায়। তারা বন্ধ কোনও কারখানার চামড়া ট্যান করার চোলগুলো ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নিয়ে কাজ করে চলে যাচ্ছে। দিন মজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন দক্ষ শ্রমিকরাও। স্থায়ী শ্রমিকের তুলনায় মজুরিও অনেক কম দিতে হচ্ছে এক্ষেত্রে। এটা এখন ট্যাংরা এবং তপসিয়া পাড়ায় পরিচিত চিত্র।

কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের হিসেব অনুসারে ভারতের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৯০ শতাংশ অংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত। এবং এই বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের বেশির ভাগ অংশের কাছেই ন্যূনতম মজুরি আইনের সুফলটুকু পৌঁছয় না। তালিকাভুক্ত শিল্পগুলোতে শ্রমিকরা সরকারের বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন কিনা তা দেখার একটা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের আছে। ব্যবস্থাটা কি রকম? পশ্চিমবঙ্গ সার্বডিনেট লেবার সার্ভিসে কয়েকজন 'মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর' আছেন। তাঁদের কাজ হল, তালিকাভুক্ত শিল্পের শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন কিনা এবং সরকারি নির্দেশ মেনে ন্যূনতম মজুরি আইন সংশ্লিষ্ট কারখানায় বলবৎ হয়েছে কিনা তা দেখা। কিন্তু 'কলকাতা এবং কিছু শহরতলী অঞ্চলে' এই কাজ করার জন্য ১৬ জন ইন্সপেক্টর বহাল আছেন। (সরকারি নথিতে অবশ্য কেবল ১৬ টি পদের কথা বলা হয়েছে। সব কটি পদেই কি ইন্সপেক্টর বহাল আছেন?) তাহলে জেলাগুলোর কি হবে? সেখানেও তো অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি আইনের ছিটেফোঁটা সুযোগও পাচ্ছেন না। আর মাত্র ১৬ জন ইন্সপেক্টরের পক্ষে কলকাতা এবং শহরতলীর হাজার হাজার ছোট কারখানা তদারকি করা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইন দেখভালের জন্য রাজ্য সরকার বলক পর্যায়ে নিয়োগের জন্য সৃষ্টি করেছে ৩৩৫ টি এগ্রিকালচারাল মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর পদ।

অবশ্য তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মজুরি বলবৎ করার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধার মুখোমুখি হতে হয় সরকারকে। সরকারি নথি থেকেই জানা যাচ্ছে, 'তালিকাভুক্ত বেশিরভাগ শিল্পেই ন্যূনতম মজুরি স্থির/বলবৎ করার ওপর একাধিক স্থগিতাদেশ জারি করেছে হাইকোর্ট।' এছাড়াও বিভিন্ন আদালতে ইন্সপেক্টররা মালিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা দায়ের করেন, তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পাল্টা মামলা ঠুকে দেয় মালিকরা। ইতিমধ্যে, ১৯৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির সরকারি হারের একটি তালিকা আমাদের হাতে এসেছে। ঐ তালিকায় যে ৩২ টি শিল্প রয়েছে তার অনেকগুলোতেই হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ বলবৎ। তালিকাটি এই রকম:

(এই তালিকার মজুরি হার কলকাতা ও ২৪ পরগণা জেলার)

শিল্প	৩১.১২.৯৩ তারিখে মজুরি হার (টাকায়)	৩১.১২.৯০ তারিখে মজুরি হার (টাকায়)
★ ১. তেল মিল	১১০৩.৪৫	৮৭৬.৯০
★ ২. ডাল মিল	১০০৪.০০	৭৮৩.০০
★ ৩. চাক্কি মিল	১০৩০.০০	৮৫১.০০
★ ৪. মোটর পরিবহন	১১৭২.৬০	৯৬০.৪০
৫. ট্যানারি ও চামড়া	১০০৯.০০	৭৮৮.০০
৬. মুদ্রণ শিল্প	৬৬১.০০	৫২৮.০০
৭. পাথর ভাঙা	৭৪২.৮৮	৬০১.০৪
৮. হাড়ের মিল	৬৭১.১৫	৫৪৩.১০
৯. সিল্ক প্রিন্টিং	১০২৬.০০	৮২৩.০০
★ ১০. লোহা ফাউন্ড্রি	১০৯৭.০০	৮৯৪.০০
★ ১১. দর্জি	১০০৮.০০	৭৮৭.০০
১২. হোসিয়ারি	৭৪৯.০০	৫৯৫.৮৯
★ ১৩. কাগজ ও বোর্ড		
ক) মেশিনে শুকনো	৮৯৮.৭৭	৭২৬.৯৮
খ) রোদে শুকনো	৬৮০.৬৬	৫৫০.৬৪
★ ১৪. যন্ত্রচালিত তাঁত	১০৪৮.০০	৮২৭.০০
★ ১৫. রাবার	১০১১.০০	৭৯০.০০
১৬. চীনামাটি	৯৯৬.০০	৭৭৫.০০
★ ১৭. নার্সিং হোম	৯৯৭.০০	৭৭৬.০০
★ ১৮. প্লাস্টিক	৯৯৬.০০	৭৭৫.০০
★ ১৯. কাঠ চেরাই	১০২৫.০০	৮০৪.০০
★ ২০. সিনেমা হল	৮৪৯.২৫	৬৮৩.৫০
★ ২১. চাল কল	৬৯৩.৪২	৫২০.৮৯
★ ২২. কৃষি (প্রতি দিন)	৩২.১১	২২.৮৮
২৩. সিনকোনা	১০১৮.৮৮	৭৬৪.৮৮
২৪. ভেষজ চাষ	১০১৮.৮৮	৭৬৪.৮৮
★ ২৫. কাচ	৯৯২.০০	৭৭১.০০
★ ২৬. বিড়ি (প্রতি হাজারে)	৪২.৪৩	৩৪.০৩
২৭. লাক্ষা	৩৭২.১০	৩১৪.৯০
২৮. রাস্তা ও বাড়ি তৈরি	৬৭১.০০০	৫৫৩.০০
২৯. ডেকরেশন	৮৬৭.৮০	৬২৪.৮০
★ ৩০. বেকারি	১০০৫.৪০	৮০২.৪০
★ ৩১. দোকান	৯৭৫.১০	৭৫৪.১০
৩২. অরণ্য সংক্রান্ত	৮৮৮.৯৯	৬৪৫.৯৯

এর মধ্যে ★ চিহ্নিত ১৯ টি শিল্পে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ জারি আছে। অর্থাৎ এই শিল্পগুলোতে ন্যূনতম মজুরির সংস্কার সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের তৈরি করা এই সাম্প্রতিক ন্যূনতম মজুরি হারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করিয়ে দিতে চাই। আমাদের দেশে 'দারিদ্র সীমা' নির্ধারিত হয় কেবল খাদ্যের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে। তাতে আবাসন বা কাপড়চোপড়ের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। দেশের ১৯৮৪-৮৫ সালে মূল্যমানের হিসেবে দারিদ্র সীমা নির্ধারিত হয়েছিল মাসিক ৫৩৩ টাকায়। এটা ছিল গ্রামীণ দারিদ্র সীমার হিসেব। ৯৩ সালের দ্রব্য মূল্যের হিসেব ধরলে দারিদ্র সীমার মাসিক হিসেব দাঁড়াবে কত টাকায়? সেটা অনুমান করতে বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এখন প্রশ্ন হল, সরকার ন্যূনতম মজুরি হার স্থির করার সময় পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের নীতি এবং দারিদ্র সীমা নির্ধারণের নীতির ফারাকটুকু খেয়াল রেখেছিলেন তো?

ন্যূনতম মজুরি আইন

স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৮ সালে তৈরি হয় ন্যূনতম মজুরি আইন। তার আগে পর্যন্ত বিধিসম্মত মজুরির কোনও ব্যবস্থা চালু ছিল না এদেশে। 'ন্যূনতম মজুরি' -- এই অভিধাটিকে নানান অর্থেই ব্যবহার করা যায়। বিশেষ কোনো শিল্পে বা কারখানায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এবং মালিকের মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষে মজুরির যে সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারিত হয় তাও ন্যূনতম মজুরি। কিংবা আদালত, মজুরি বোর্ড, বেতন কমিশন কিংবা ঐ ধরনের কোনও মজুরি নির্ধারক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত মজুরি বলতে আমরা বোঝাব, কোন একটি রাজ্যের কোন শিল্পে সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরি, যা আইনসম্মতভাবে বলবৎ করা যাবে। প্রধানত যে সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ইউনিয়ন তৈরি করে মালিক পক্ষের কাছে থেকে দাবি দাওয়া আদায় করতে পারেন না, সাধারণভাবে তাঁদের মজুরি সুরক্ষিত করতেই এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের চরম বঞ্চনার শিকার।

দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ভারত সরকার একটি শিল্প সম্মেলনের (ইন্ডাস্ট্রিজ কনভেনশন) আয়োজন করে। সেখানে সরকারি প্রতিনিধি, মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার নাম দেওয়া হয় শিল্প শান্তি প্রস্তাব (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রুস রেজলিউশন)। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকদের সঠিক মজুরি নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয় প্রস্তাবে। সেই সম্মেলনেই সরকার গঠন করে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ। এই পরিষদ তার প্রথম বৈঠকের পর একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি করে। নাম 'ন্যায্য মজুরি কমিটি' (ফেয়ার ওয়েজ কমিটি)। ন্যায্য মজুরি কিসের ভিত্তিতে স্থির হবে তার নীতি এবং সেই নীতি কিভাবে কার্যকর হবে তা সুপারিশের দায়িত্ব পড়ল ঐ কমিটির ওপর। 'ন্যায্য মজুরি কমিটি' ১৯৪৮ সালে প্রথম 'ন্যূনতম মজুরি'র একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা তৈরি করে। এবং একই সঙ্গে ন্যূনতম মজুরি (মিনিমাম ওয়েজ), ন্যায্য মজুরি (ফেয়ার ওয়েজ) এবং নিছক প্রাণ ধারণের মজুরির (লিভিং ওয়েজ) ফারাকগুলো কোথায় তাও বুঝিয়ে বলে দেয়। ন্যায্য মজুরি কমিটির রিপোর্টেই বলা হল: ন্যূনতম মজুরি কেবল প্রাণ ধারণের ব্যবস্থাটুকুই নয়। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চিকিৎসা ও সুযোগ সুবিধাগুলো, অবশ্যই ন্যূনতম মজুরির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার কিছু আগে মজুরি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করলে সরকার মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সমস্যায় পড়ে যায়। অবশ্য, মজুরি হার স্থির করার ব্যাপারে শ্রমিকদের তরফ থেকে একটা চাপ ছিলই। বস্তুত ত্রিশের দশকের শেষের দিকেই শুরু হয়েছিল দেশজুড়ে শ্রমিক আন্দোলন। তখন ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনেই (১৯৪৩) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের নীতি নিয়ম ঠিক করা এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার প্রশ্নটি সামনে এসে যায়। ১৯৪৪ সালে বিষয়টি পাঠানো হয় স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির কাছে। কমিটি প্রশ্নটি উত্থাপন করে ১৯৪৪ সালে। এবং এর পরেই সরকার ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল তৈরি করে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রম সম্মেলনে আলোচনা হয়

খসড়াটি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বিলটি পেশ করা হয় ১৯৪৬ সালে। বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। এই আইনটিই ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮।

কিন্তু ন্যূনতম মজুরির কোনও সংজ্ঞা নির্ধারিত হল না এই আইনে। বলা হল না কি কি থাকবে ন্যূনতম মজুরির মধ্যে। কারা মজুরি নির্ধারণ করবেন তার একটা রূপরেখা আইনে থাকলেও, ন্যূনতম মজুরির হার তারা কিভাবে স্থির করবেন তার কোনও সুপারিশ ছিল না। ১৯৪৮ সালে ন্যায্য মজুরি কমিটি 'ন্যূনতম মজুরির' একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা ঠিক করে দেওয়ার অনেক পরে ১৯৫৭ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে প্রথম প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির নীতি নির্ধারণ হয়।

মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যেখানে শ্রমিকরা আন্দোলনে যেতে পারছেন না এবং অপেক্ষাকৃত বেশি শোষিত সেখানে ন্যূনতম মজুরির নির্ধারণের নীতি ঠিক হল এই ভাবে:

ক) **তিন জনের একটি পরিবারের** (স্বামী, স্ত্রী ও শিশু সন্তান) প্রয়োজনের ভিত্তিতে একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি স্থির হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের স্ত্রী ও শিশুদের আয় গ্রাহ্য হবে না।

খ) **খাদ্য:** প্রখ্যাত পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডঃ আক্রয়েডের সুপারিশ অনুযায়ী একজন পুষ্টির জন্য প্রয়োজন দিনে ২৭০০ ক্যালরি।

গ) **জামা কাপড়:** বছরে মাথা পিছু ১৮ গজ কাপড় অর্থাৎ সারা বছরে গোটা পরিবারের জন্য লাগবে ৭২ গজ কাপড়।

ঘ) **আবাসন:** নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য তৈরি শিল্প আবাসন প্রকল্পের বাড়িগুলোর সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম ভাড়া যোগ হবে মজুরির সঙ্গে।

ঙ) **জ্বালানি এবং অন্যান্য বিভিন্ন খরচ** বাবদ দিতে হবে মোট ন্যূনতম মজুরির ২০%।

ডঃ আক্রয়েডের সুপারিশ অনুযায়ী মাথাপিছু যে ২৭০০ ক্যালরি স্থির হয়, তার খাদ্য তালিকাটি ছিল এই রকম:

চাল/গম —	১৪ আউন্স
ডাল —	৩ আউন্স
শাক —	৪ আউন্স
মাটির নিচের সবজি —	৩ আউন্স
অন্যান্য সবজি —	৩ আউন্স
ফল —	৩ আউন্স
দুধ —	১০ আউন্স
চিনি/গুড়	২ আউন্স
তেল/ঘি —	২ আউন্স
মাছ ও মাংস —	৩ আউন্স
ডিম —	১ আউন্স

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের বাজার দর অনুযায়ী এই খাদ্য তালিকার মোটামুটি ১০.১৯ পয়সা। অর্থাৎ তিন জনের জন্য ৩০.৫৭ পয়সা, মাসে ৯১৭ টাকার। তিনজনের কাপড় জামা লাগবে বছরে ১৩২০ টাকা হিসেবে (২০ টাকা মিটারের কাপড়) মাসে ১১০ টাকার। ঘরভাড়া কোনভাবেই ১৫০ টাকার নিচে নয়। খাদ্য, আবাসন, বস্ত্র মিলিয়ে মাসে তিন জনের খরচ ১১৭৭ টাকা। এর সঙ্গে জুড়তে হবে জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১১৭৭ টাকার ২০%। সব মিলিয়ে আজকের বাজার দর অনুযায়ী একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি দাঁড়ায় মাসে ১৪১২ টাকা। মনে রাখতে হবে চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের মতো প্রয়োজনীয় খরচগুলো ন্যূনতম মজুরির মধ্যে ধরা হয় না। অথচ ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ন্যূনতম মজুরির যে হার আমরা 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ পাচ্ছি সেখানে পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ধার্য হয়েছে মাসিক ১৪৬.৭৬ টাকা। যাঁরা ন্যূনতম মজুরি স্থির করেন তাঁরা সর্বদিক বিবেচনা করেই কাজ করেন নিশ্চয়! কারণ

কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমান কিংবা পুরুলিয়ার মজুরি হারের মধ্যে বেশ খানিকটা তারতম্য। এবং একারণে গোটা রাজ্যকে ভেঙে ফেলা হয়েছে তিনটি 'গ্রুপে' — 'এ', 'বি', 'সি'। যাই হোক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের নীতি মেনে মজুরি স্থির করলে এক এক শিল্পে এক এক ধরনের মজুরি কেন স্থির হয় তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ বেলেঘাটার সরকার বাজার কিংবা শিয়ালদার ফুটপাথের বাজার অথবা তপসিয়ার পাড়ার বাজারে জিনিস পত্রের দাম বিশেষ বেশি-কম হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরির এই তারতম্য বোধগম্য নয়। যেমন বোধগম্য নয় সি আই টি ইউ কেন মাসিক ন্যূনতম মজুরি দাবি করে ১০৫০ টাকা। কিসের ভিত্তিতে? সি আই টি ইউ অবশ্য একটা ভিত্তির কথা বলেছে। বলেছে, পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির কথা। এবং তা মাসিক ১০৫০ টাকা, মূল্যসূচক ৮০০ (ভিত্তিবর্ষ ১৯৬০)-এর ভিত্তিতে। সংবিধানের নবম তফশিলে ন্যূনতম মজুরি আইনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলেছে সি আই টি ইউ। এবং এই রকম ২২ টি দাবি আদায়ের জন্য অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে আগামী ১৪ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটে শ্রমিক কর্মচারীদের সামিল হতে বলা হয়েছে। যাবতীয় দাবিই অবশ্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। অথচ ন্যূনতম মজুরি আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের গাফিলতির দিকটি সি আই টি ইউ বিস্মৃত। ন্যূনতম মজুরির সর্বশেষ যে সরকারি হার ঠিক করা হয়েছে সেখানেও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই ১০৫০ টাকা বা তার কাছাকাছি মজুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মজুরির হার তার অনেক নিচে।

এখন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে একটু তুলনা করে দেখা যেতে পারে, শ্রমিক 'শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধ' বামফ্রন্ট সরকার কতটা দায় বোধ করেছেন শ্রমিকদের জন্য। আর আর অন্যান্য রাজ্যের 'প্রতিক্রিয়াশীল' সরকাররাই বা কতটা 'শ্রমিক বিরোধী'।

বিভিন্ন রাজ্যে ন্যূনতম মজুরির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দৈনিক হার (৩০.৯.৯১)

রাজ্য	*ন্যূনতম মজুরির আওতায় শিল্পের সংখ্যা*	*সর্বনিম্ন*	*সর্বোচ্চ*
আসাম	৯৮	৭.০০*	২৫.০০
বিহার	৬৩	১৫.০০	২৫.০০
গুজরাট	৫০	১১.০০	৩১.০০
মহারাষ্ট্র	৮০	১১.০০	৩১.০০
পাঞ্জাব	৬৩	৩১.৭০*	৩৩.৯৫
তামিলনাড়ু	৭১	৭.০০*	৩৫.০০
উত্তরপ্রদেশ	৬৬	৮.৫০	২০.০০
পশ্চিমবঙ্গ	৫১	১৬.৩৪	২১.৬২

** মহার্ঘভাতা মজুরির মধ্যে ধরা নেই।*

■ *সর্বশেষ তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ৫৬ টি শিল্পকে ন্যূনতম মজুরির আওতায় আনতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ৩৮ টি ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি স্থির হয়েছে।*

কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক রাজ্যকে নিয়ে সারণিটি তৈরি করা হয়েছে। সারণি থেকে সারা ভারতে ন্যূনতম মজুরির অবস্থার একটা তুলনামূলক ছবি নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের গৃহীত নীতির কিছুটা ছাঁট কাট করেছে। মাথাপিছু ২৭০০ ক্যালরি খাদ্যের জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে মজুরি স্থির হয় ২২০০ ক্যালরির হিসেবে। কারণ রাজ্য সরকার ধরে নিয়েছে ২২০০ ক্যালরি খেলেই চলে যাবে একজন শ্রমিকের। মাথাপিছু ক্যালরির হার কমিয়ে মজুরি ঠিক করা কেবল নীতিহীনতাই নয়, নিষ্ঠুর অমানবিকতাও বটে। আধুনিক পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী একজন শ্রমিকের ২৭০০

ক্যালরিই যথেষ্ট নয়। তাঁর প্রয়োজন ন্যূনতম ৩৬০০ ক্যালরি। অথচ শ্রমিক-স্বার্থে স্বাক্ষরিত একটি সর্বসম্মত চুক্তিকেও অগ্রাহ্য করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। 'শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধ' এই সরকার কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দাবি দাওয়া হত্ত্বেও পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ রূপায়ণের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। সি পি এমে শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ অবশ্য ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নে যাবতীয় দায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে খালাস। ন্যূনতম মজুরি সংস্কারের ক্ষেত্রেও ৫ বছরের সময়সীমাও মানে না রাজ্য সরকার। ১৯৮৫ সালের পর তালিকা-ভুক্ত কোনও ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি সংস্কার হয়নি। বেশিরভাগ সংস্কারই ঘটেছে সত্তর দশকের শেষের দিকে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পরই। মূল্য সূচক, মহার্ঘভাতা ইত্যাদি শব্দগুলো তো অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছে প্রায় 'হিব্রু'। এবং এ সবই কেতাবি প্রতিশ্রুতি মাত্র। আমরা রাজ্যের কয়েকটি অসংগঠিত শিল্পে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারের বেঁধে দেওয়া হারে মজুরি পাননা শ্রমিকরা। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে মজুরি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। এইসব আন্দোলন অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের দাবি দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। বস্তুত ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নে অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক, মালিক এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতার সংকলনে যে ছবি ফুটে ওঠে তা নিতান্তই ক্লিন্ন, মলিন এবং গাঢ় হতাশায় ভরা।

◆

তারজাল শিল্প

বিশাল একটা ছাউনি। প্রায় ৬০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া। প্রবেশপথ একটাই ; কপাটহীন। বিদ্যুতের আলো নেই এই ঘরে, খুঁটির গায়ে গোঁজা আছে কেরোসিনের কুপি। এই ছাউনির নিচে বিশাল দানবীয় তাঁত — তারের জাল বোনার যন্ত্র। এই তাঁতে ১০০ ফুট লম্বা তারের জাল টানা বোনা যায়। [illegible], কাঁকুড়গাছি, নারকেলডাঙা, উল্টোডাঙা এলাকা জুড়ে শতাধিক বছরের পুরোনো এই শিল্পের ভেতরকার চেহারাটা ভয়ংকর আদিম। এখানে তৈরি হয় মূলত মিট সেফ, চালুনি, বাগানের বেড়া, জানলায় লাগানোর জাল। এছাড়া অন্যান্য কাজেও এ-জাল ব্যবহৃত হয়।

এই অঞ্চলের ১৭ টা কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৫০। এই শিল্পে কাজ হয় মূলত ফুরনে। দিনে সাড়ে আট ঘণ্টা কাজ ; তার মধ্যে আধ ঘণ্টা টিফিন। ১০০ ফুট বাই ৩ ফুট জাল তৈরি করতে অন্তত ৫ জন লোক লাগে। একটা ১০০ ফুট জালের ফুরনে পাওয়া যায় "৫ রোজ ৩ পো" মজুরি। রোজের হিসেবে একজন 'তাঁতি' বর্তমানে পান ৬ টাকা ২৬ পয়সা ; 'মাঝের লোক' পান ৫ টা. ৮৩ প.। 'ঝাঁপি' পান ৫ টা. ২৫ প. আর 'যোগাড়ের' মজুরি ৫ টাকা ৭২ পয়সা। কাজটা ফুরনে হওয়ায় কাজ করতে হয় দ্রুত। জাল বুনতে সময় যত বেশি লাগবে, আনুপাতিক মজুরি কমবে সেই হারে। কখনও বেশি কাজ থাকলে ওভারটাইম হয় তবে, সেটা সন্ধ্যে ৭ টা পর্যন্ত। এর জন্য পাওয়া যায় বাড়তি ২ রোজের টাকা আর টিফিনের ২ টা. ১৫ প.। তবে বর্তমানে মন্দার বাজারে সপ্তাহে তিন দিনের বেশি কাজ পাচ্ছেন না কোন শ্রমিক। এই শিল্পটি প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় হলেও রাজ্য সরকারের ন্যূনতম মজুরির স্বীকৃতি পায় নি এখনও। তবে এখানে শ্রমিক সংগঠনের ঐতিহ্য বেশ পুরোন। এখানকার ইস্ট ক্যালকাটা ওয়্যারনেটিং শ্রমিক ইউনিয়নের বয়স ১৫ বছর। তারও আগে প্রায় ৩৫ বছর ধরে বামপন্থী পার্টির একটা ইউনিয়ন ছিল এখানে। শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার ফলে মালিকপক্ষের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে তাঁরা অনেক দাবিই আদায় করে নিতে পেরেছেন। ১৯৯২ সালে পুজোয় বোনাস পেয়েছেন ৮০০ টাকা। চুক্তিমোতাবেক ১৯৯৩-এ পাবেন ৮৫০ টাকা। বছরে ৫ দিন উৎসব ও জাতীয় ছুটি বাবদ দিনে ২৫ টা. হিসেবে মোট ১২৫ টা. দেওয়া হয় কালিপুজোর আগে। অবসরপ্রাপ্ত বা মৃত অথবা অথর্ব হয়ে পড়লে শ্রমিকরা আগে পেতেন মাত্র এককালীন ৭৫০ টাকা। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ৫ বছর যিনি কাজ করেছেন,

তিনি প্রথম ৫ বছরের জন্য ১০০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১০০ টাকা হিসেবে অনুদান পাবেন। চুক্তিতে নির্দিষ্ট জালের জন্য লোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যার চেয়ে কম লোক দিয়ে ঐ কাজ করিয়ে নেওয়া চলে না। ইউনিয়নের সদস্য যাঁরা, তাঁরাই কেবলমাত্র কাজ পাবেন।

তা সত্ত্বেও তারজালের শ্রমিকরা কোনোমতেই মাসে ৫০০ টাকার বেশি আয় করতে পারেন না। কারণ সর্বত্র যান্ত্রিকীকরণের যুগে হাতে বোনা তারজালের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মেশিনে বোনা জাল যা অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিনন্দন। তবে মজবুতির দিক থেকে হাতে বোনা জালের বিকল্প এখনো নেই। তবু কাজ কমে আসছে — একটা-দুটো করে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। জায়গা নিচ্ছে যন্ত্র-চালিত তাঁত। আশ্চর্য রকমের একটা বৈপরীত্য চোখে পড়ে হস্তচালিত আর যন্ত্রচালিত তারবোনার তাঁত কলে। হাতে বোনা তার জালের অধিকাংশ শ্রমিক পঞ্চাশোর্ধ্ব, রুগ্ন। তাঁদের চেহারায় অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। বেশির ভাগই বাঙালি, অল্প কিছু ওড়িয়া। অন্যদিকে যে-সব কারখানায় যন্ত্রচালিত তাঁতে নানা ধরনের গার্ডেন-নেট তৈরি হচ্ছে, সেখানে অধিকাংশই শিশু শ্রমিক। তাদের বয়স ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। কেউই স্থায়ী নয়। এরা কাজ করে ঠিকাদারের অধীনে। মজুরি বা ছুটি-ছাটাও অনির্দিষ্ট। কারণ এরা কেউই ইউনিয়নের সদস্য নয়।

মুদ্রণ শিল্প

বিপ্লব এসেছে মুদ্রণ শিল্পে। পি টি এস, ডি টি পি আর অফসেটের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে লেটার প্রেস। প্রায় ২৫০ বছরের পুরোন এই ঐতিহাময় শিল্প আজ বিপন্নতার মুখে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এ-রাজ্যে ছাপাখানা ছিল ৩৫০। সেখানে ১৫,৬০২ জন শ্রমিক কাজ করতেন। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে প্রেসের সংখ্যা প্রায় ২,০০০ আর কর্মী সংখ্যা লক্ষাধিক। এই হিসেব থেকে আরও জানা গেছে, প্রেসগুলোর ৮৫ শতাংশই ছোট ছোট ইউনিট এবং এখানে কর্মী সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন। মাঝারি প্রেস ১২ থেকে ১৩ শতাংশ। কর্মীসংখ্যা ১০ থেকে ৪৯ জন। আর ৫০ জন বা তারও বেশি কর্মী আছেন এরকম বড় প্রেসের সংখ্যা মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ। এই ছাপাখানাগুলো বেশিরভাগই কলকাতা ও শহরতলীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কয়েকটি মফস্বল শহরেও এই ধরনের প্রেস অল্প বিস্তর আছে।

অন্যান্য অসংগঠিত শিল্পের মতো এই শিল্পেও মজুরির হার অস্বাভাবিক রকমের কম। ছোট এবং বেশির ভাগ মাঝারি প্রেসগুলোয় দিনে আট থেকে ন'ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে কর্মীরা মাসিক ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা পেয়ে থাকেন অথচ মুদ্রণ শিল্পে রাজ্য সরকারের ন্যূনতম মজুরির হার মাসে ৬৬১ টাকা। কাজের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউবা আধ ঘণ্টা ছুটি পান খাবার জন্য — কেউবা তাও পান না। বেশি কাজ থাকলে কখনও-কখনও ওভারটাইম হয় ২-৩ ঘণ্টা। প্রাপ্য মজুরির দেড়গুণ হিসেবে মজুরি ওভারটাইম বাবদ এবং দেড় থেকে দু'টাকা জলখাবারের জন্য দেওয়া হয়। তবু সবকিছু মিলিয়ে কেউই মাসে ৮০০-৯০০ টাকার বেশি পান না। বলাই বাহুল্য, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি বা কোন চিকিৎসার সুযোগ এঁদের প্রাপ্যের তালিকায় পড়ে না। আজকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অফসেটের প্রকোপে সারাদিনের কাজই প্রায় জুটছে না, ওভারটাইমের প্রশ্নই ওঠে না।

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো শ্রী আর্ট প্রেসের কর্মী সংখ্যা মাত্র ১০। অথচ এঁরা সবাই সরকারি হারে ন্যূনতম মজুরি পেয়ে থাকেন। প্রেসের মালিক জানালেন যে ১৭/১৮ বছর ধরে তাঁর বাবার আমল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। এই প্রেসের কর্মীরা দক্ষতা অনুযায়ী মাসে ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকা পেয়ে থাকেন। ওভারটাইমে প্রতিঘণ্টায় আড়াই ঘণ্টার সমান মজুরি দেওয়া হয়। পুজোর সময়ে ১০ দিন সমেত বছরে মোট ২৩ দিন ছুটি পান প্রত্যেক শ্রমিক। এছাড়াও প্রতি ২০ দিন কাজের জন্য ১ দিনের ছুটি পাওনা হয়। শনিবার হাফছুটি। এখানকার সব শ্রমিকই গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ই এস আই-এর সুবিধা পান। বোনাস পান ১১ শতাংশ হারে। এই প্রেসে ভব কাজই বেশি হয়।

অবশ্য এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র। বড় প্রেস এবং কয়েকটা মাঝারি প্রেসের কর্মচারীরাই এই সমস্ত সুবিধা-সুযোগ ভোগ করেন। কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক

ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্য হবার সুবাদে তাঁরা এইসব দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। মুদ্রণ শিল্পের এই ঐতিহ্যময় ক্ষেত্রটির অবস্থা সত্যিই ভাল নয়। কারণ আজকের প্রবল কর্মহীনতার যুগেও ছাপাখানার কাজে কোন নতুন ছেলে মেয়ে আসছে না।

বাল্ব-তৈরি শিল্প

অন্যান্য অসংগঠিত শিল্পের তুলনায় বাল্ব তৈরির শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। কারণটা অবশ্য পরিষ্কার। মহিলা শ্রমিকদের মজুরি দিতে হয় পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম। এক মালিক খোলাখুলিই স্বীকার করেছেন এই সত্য। আর এক মালিক অবশ্য বললেন, সূক্ষ্ম কাজে ধৈর্য লাগে। আর মহিলাদের ধৈর্য বেশি। নিম্নবিত্ত যে মহিলারা এই কারখানাগুলোতে কাজ করতে আসেন তাঁদের একটা বড় অংশ লোকের বাড়িতে কাজ করতেন নাম মাত্র পারিশ্রমিকে। সে তুলনায় বেতন এখানে বেশি। এবং পেশা হিসেবেও সম্মানজনক। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা বাড়লে একজন শ্রমিক মাসে ৬০০/৭০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেই পারেন। লক্ষণীয়, বাল্ব তৈরির যে পর্যায়ে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে পুরুষ শ্রমিকদেরই একচেটিয়া। এবং যন্ত্রের কাজে মজুরিও অনেক বেশি। কেউ কেউ মাসে হাজার টাকারও বেশি পান। অথচ শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজে ঢুকে সমান মজুরি পান মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকরা। পরে মহিলারা কিছু বিশেষ ধরনের কাজে আটকে থাকেন, পুরুষরা হাত পাকান মেশিনে। বাল্ব শিল্পে শ্রমিকদের গড় বয়স বেশ কম — কিশোর-কিশোরী। মনে রাখতে হবে সরকারি ন্যূনতম মজুরির আওতায় এখনও আসেনি এই শিল্প।

বেলেঘাটা-মানিকতলা অঞ্চলে এই বাল্ব-শিল্প কুটিরশিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। এখন এর ইউনিটের সংখ্যা প্রায় ৫০০। ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করে পূর্ব কলকাতার কারখানাগুলোতে। বারাসত, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার, হাওড়া, বেলগাছিয়া, কসবা ইত্যাদি অঞ্চলেও কিছু কারখানা আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সব মিলিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ। বহু বড় কোম্পানী বেনামীতে এইসব ছোট কারখানা থেকে মাল তৈরি করিয়ে বাজারে বিক্রি করে। এই কারখানাগুলোতে সাধারণত ৪০, ৬০ এবং ১০০ ওয়াটের বাল্ব ছাড়াও নাইট ল্যাম্প, টুনি বাল্ব এবং ইন্ডিকেটর বাল্ব তৈরি হয়। এই বাল্বের প্রধান বাজার মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে।

উৎপাদিত পণ্যের রমরমা বাজার থাকলেও শ্রমিকদের অবস্থা বেশ খারাপ। কারখানায় কাজে ঢুকে একজন নতুন কর্মী ২০০ থেকে ২৫০ টাকার বেশি পাননা। বেশিরভাগ ল্যাম্প কারখানায় কাজ হয় সকাল আটটা থেকে রাত আটটা/নটা পর্যন্ত। প্রথমে ৮ ঘণ্টার পর বাকিটা ওভারটাইম। ওভারটাইমের মজুরির হার দেড় গুণ। তাছাড়াও টিফিন বাবদ ১ টাকা/২ টাকা পাওয়া যায়। সপ্তাহে ছুটি ছাড়া বাড়তি কোন ছুটি নেই বললেই চলে। পেনশন, পি এফ বা ই এস আই-এর তো বালাই নেই। অসুখে-বিসুখে ছুটি বা চিকিৎসার খরচ নির্ভর করে মালিকের মর্জির ওপর। অথচ তেমন কোন শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব এখানে নজরে আসে না।

ই এস আই ও মেটারনিটি বেনিফিট আইন

শ্রমজীবী মহিলার স্বাস্থ্য অধিকার

বর্তমান যুগে সামাজিক কাঠামোর বদল আর নগরায়নের ফলে ক্রমে বেশি বেশি করে মহিলারা বের হচ্ছেন রুটি-রুজির সন্ধানে, সামিল হচ্ছেন শিক্ষা আর পেশার দৌড়ে। স্কুল-কলেজ, অফিস-দপ্তরে, মহিলাদের বেশি বেশি করে দেখতে পাবার ঘটনা থেকে এমন ধারণা তৈরি হওয়ারই কথা। আর উচ্চ ও মধ্য-মধ্যবিত্ত সমাজে এটা ঘটনাও বটে। কিন্তু তারই পাশাপাশি নিঃশব্দে একটা উল্টোমুখী গতিও চলেছে চোখের আড়ালে। তা হল শ্রমিক — সংগঠিত শ্রমিক দল থেকে অর্থাৎ কলকারখানার কাজ থেকে ক্রমশ মহিলা শ্রমিকদের সরিয়ে দেবার ঘটনা। হুগলি নদীর দুপার ধরে প্রায় শ'দুয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠা পাট ও সুতি শিল্পে বেশিরভাগ কারখানাতেই, এমনকি দুদশক আগেও ছিল শিশু আবাস — ক্রেশ ও নার্সারি, কর্মরত শ্রমিক মায়েদের বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য বন্দোবস্ত। কারখানার আইনে বলা ন্যূনতম সংখ্যক নারীশ্রমিক না থাকার জন্য এখন কোনও পাট কল ও সুতিবস্ত্র কারখানায় ক্রেশ ও নার্সারি নেই। আদতে গত দু-তিন দশক ধরে ক্রম যান্ত্রিকীকরণ, ক্রমবর্ধমান বেকারি, পুরোনো মূল্যমানে হিসাব করলে আনুপাতিক হাতে মজুরি হ্রাস ও সস্তা শ্রমের বাজার তৈরি হওয়ার ফলে নারী শ্রমিক বিতাড়ন আজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এক্ষেত্রে আর্থিক, সামাজিক নানা কারণ ছাড়াও নারী শ্রমিক মাত্রকেই 'প্রজনন যন্ত্র' অর্থাৎ সম্ভাব্য মা হিসাবে দেখা এবং মাতৃত্বকালীন আইনী সুযোগ দিতে শিল্প মালিকদের অনীহারও ভূমিকা আছে। তাই বলছি, ফুরন আর বদলির ঠেকা শ্রমিকের অফুরান জোগান যেখানে নিশ্চিত, সেখানে নারী শ্রমিককে নিয়োগ করে মাতৃত্বকালীন সুযোগ, ক্রেশ, নার্সারির ঝামেলা কে পোহাতে চায়! এ নিয়ে কিন্তু কোনও আলোচনাও ওঠেনি গত বিশ বছরে!

পশ্চিমবঙ্গে হালে ১৯৮৮ সালে যেখানে গড়ে দৈনিক ৩৭,২৮২ জন মহিলা শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে কাজ করতেন, ১৯৮৯তে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩,৫৪৪ জন। ১৯৯০তে আরও কমে ২২,৭৯৭ জন। নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজে কাজ পাবার সুযোগের এই ক্রমসংকোচনের পাশাপাশি, শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা কিন্তু নানা পেশা ও আধুনিক শিল্পে নিয়োজিত হচ্ছেন। এই সব পেশার মধ্যে নার্সিং, শিক্ষকতা, দপ্তরে চাকুরি এবং সদ্য শুরু হওয়া ইলেকট্রনিক শিল্পের উল্লেখ করা যায়। এই চালচিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। শুধু মহিলাদের ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি শেখানোর জন্য ৫০টি সিটের পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে। নার্সের চাহিদা ও যোগানের অপ্রতুলতা মেটাতে কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান-সহ বেশ কিছু জেলায় খুলেছে নার্সিং স্কুল। আপাতভাবে এ সবই নারীপ্রগতি তথা সমাজের এগোনর চিহ্ন বলে মনে করা যেত, যদি না খেয়াল করা যায় ইলেকট্রনিক শিল্প তথা নার্সিং-জাতীয় পেশায় কি ভীষণ আইনসম্মত শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন নারীরা। এক্ষেত্রে নার্সিং কর্মীদের সরকারি হাসপাতালে সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৪৮ ঘন্টা ডিউটি, প্রতি ৩০ দিনের ভেতর ১০ দিন ১২ ঘন্টার নাইট ডিউটি। আর 'আধুনিক' ইলেকট্রনিক শিল্পে গড়ে দিনে ৭-৮ ঘন্টার ডিউটি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকা চাকরি না দিয়ে ফুরনে কাজ করান হয় এক্ষেত্রে কোনওরকম স্বাস্থ্য পরিষেবার অনুপস্থিতির কথা খেয়াল করা যেতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে একটা নিয়োগপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হল। গোপনীয়তার খাতিরে নারী কর্মীর নাম ও সংস্থার নাম উল্লেখ করা হল না।

The Company is pleased to confirm your appointment as TECHNICIAN with effect from 1st February 1989 on the following terms and conditions:

(1) You will be paid a consolidated salary of Rs. 800.00 (Rupees Eight Hundred) only per month.

(2) Your increment and future prospects in the Company shall entirely depend on your efficiency, hard-work, punctuality, sincerity, good conduct and such other relevant factors.

(3) Your leave and other benefit, if any, shall be governed and regulated as per the Rules and Regulations of the Company and shall be binding on you.

(4) As a full time employee, you will devote full time and energy for promoting and protecting interests of the Company.

এরপর শিল্প সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু নারী শ্রমিক কর্মচারীদের অন্যতম আইনী অধিকার স্বাস্থ্যের প্রশ্নটিকে এখানে নেড়ে চেড়ে দেখার চেষ্টা করা যাক।

শ্রমিকের স্বাস্থ্য 'সুরক্ষার' জন্য ই এস আই এবং নারী শ্রমিক

সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য চালু ই এস আই ব্যবস্থার মেডিক্যাল বেনিফিট স্কিম হল ঐ ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকেরও স্বাস্থ্য সেবার একমাত্র ব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধারণভাবে পুরুষপ্রধান সমাজে পুরুষপ্রধান শ্রমশক্তির জন্য চালু ব্যবস্থায় নারীর বিশেষ গুরুত্ব পাবার প্রয়োজনটুকুও অনুভূত নয়। ই এস আই-তে নারী শ্রমিকদের (এবং পুরুষ শ্রমিকের বাড়ির মহিলাদেরও) শুধু 'মা' বা ভবিষ্যতের 'মা' হিসাবেই সম্ভবত দেখা হয়। তাই যেখানে নারীর জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলাদা বন্দোবস্তের, সেখানে ই এস আই কানুন নারী শ্রমিকের জন্য 'মেটারনিটি বেনিফিট' বা মাতৃত্বকালীন সুবিধার মামুলী বন্দোবস্তের বাইরে কিছু করে উঠতে পারেনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই-ভুক্ত ৪৯ লাখ উপভোক্তার ভিতর প্রায় ১০ লাখ হলেন মহিলা। এঁরা বিভিন্ন বয়স ও পেশার কর্মী। ই এস আই-এ চালু মেটারনিটি বেনিফিটের আলোচনা পরে করা যাবে। আগে দেখা যাক নারী শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য সেবার কী ব্যবস্থা সেখানে আছে।

টি বি রোগ চিকিৎসা : ই এস আই-এর অধীন মোট ১২টি হাসপাতালের ১টি হল টি বি রোগীদের জন্য। বেলুড়ের ঐ হাসপাতালের ২০০টি চালু শয্যাই পুরুষ রোগীদের জন্য। ই এস আই-এর নিজস্ব হাসপাতালে নারী শ্রমিকের জন্য টি বি শয্যা আছে ৩০টি। ই এস আই-এর নিজের হাসপাতালে মোট টি বি বেড ২৭৫টি। অথচ বীমাকৃত মোট লোকসংখ্যার ½ ভাগই নারী। ফলত লাগাতার টিবি রোগাক্রান্ত রোগিণীর লাইন লেগেই থাকে একটা শয্যা পাওয়ার জন্য।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ব্যবস্থা : এর পরই আসে বয়স ও প্রজনন ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা। গোটা পশ্চিমবঙ্গে ৪২ লক্ষ ই এস আই-ভুক্ত মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেবার জন্য রয়েছে মোট ৪১০টি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দান ইউনিট। ঐ ৪২ লক্ষ উপভোক্তার প্রায় ১০ লাখ মানুষ নারী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দানের জন্য মোট আটটি জেলায় রয়েছে মাত্র ১৫টি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দান ইউনিট।

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য দশটি হাসপাতালের একটিতেও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার কোনও আলাদা ওয়ার্ড নেই। পুরুষ রোগীদের জন্য আলাদা মেডিক্যাল ও সার্জিকাল ওয়ার্ড আছে। অথচ নারীদের মেডিক্যাল, সার্জিকাল এবং স্ত্রীরোগ সব একই ওয়ার্ডে। ফলে আনুপাতিক হারে

শয্যা সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই অপেক্ষা, দৌড়াদৌড়ি ছাড়া নিজের চাঁদায় চলা ই এস আই হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য নারী শ্রমিকের হয় প্রাণান্ত। অথচ প্রতিটি ই এস আই হাসপাতালেই কিন্তু একাধিক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছে — যাঁরা সাধারণ চিকিৎসার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু একজন এ্যানাস্থেসিয়া বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের অভাবে স্ত্রীরোগ চিকিৎসার শয্যা চালু করা যায়নি — এমনও শোনা যায়।

নারী শ্রমিকের চিকিৎসার এমন হাল দেখে শিশুরোগ চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত আশা করাই দুষ্কর। ই এস আই-এর শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিমাণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও শিশুরোগ চিকিৎসার কোনও বিভাগ চালু হয়নি। যদিও ই এস আই কর্পোরেশন-এর বেঁধে দেওয়া মানদণ্ড অনুসারে সে ব্যবস্থা থাকার কথা।

এবারে আসা যাক মেটারনিটি বেনিফিট-এর কথায়।

মেটারনিটি বেনিফিট আইন ১৯৬১

ভারতে ১৯৬১ সালে কর্মরতা মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষার অঙ্গ হিসাবে চালু হয় মেটারনিটি বেনিফিট আইন। আইনে বলা আছে গর্ভকালীন অবস্থায় মহিলা কর্মী মোট ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি পাবেন। এবং গর্ভপাতের ক্ষেত্রে পাবেন ৬ সপ্তাহের সবেতন ছুটি। কিন্তু আগের আলোচনাতেই দেখা গেছে ঐ আইন চালু হবার পর থেকেই শিল্পে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দ্রুত হারে কমছে। আজকের ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেই মাত্র ৬ শতাংশ চাকরি মহিলারা পান। আন্দাজ করা যেতে পারে বেসরকারি ক্ষেত্রে চিত্রটা আদৌ উজ্জ্বলতর নয়। শিল্প থেকে ক্রমশ নারী শ্রমিক তাড়ানর পাশাপাশি মেটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে নানান বেআইনী পীড়ন চলছে। স্টেট ব্যাঙ্কের এক সার্কুলারে বলা হয়েছে যে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা মেটারনিটি বেনিফিটের আইনমাফিক ৬ সপ্তাহের ছুটি অধিকার হিসেবে পাবেন না, পাবেন কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির দান হিসেবে, তাও যদি ব্যাঙ্কের ডাক্তার এব্যাপারে সুপারিশ করেন। টেলিফোন দপ্তরেও এসেছে একই ধরনের নির্দেশ — দুটির বেশি সন্তান হলে মহিলা কর্মী প্রসবকালীন সুবিধা সুযোগ পাবেন না। একদিকে অপ্রতুল শিশুস্বাস্থ্য সেবা, ক্রমক্ষীয়মান সরকারি চিকিৎসা সেবা, কলুষিত পরিবেশ -- অন্যদিকে বেআইনী চাপ দিয়ে মানুষের প্রজননকেও নিয়ন্ত্রণ করার, নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা নানা সরকারি সংস্থায় চোখে পড়ছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ পাওয়া যাবে অনেক।

সরকারি, আধা-সরকারি বিভাগের থেকে এ বিষয়ে এককাঠি এগিয়ে আছে বেসরকারি ক্ষেত্র। অসংগঠিত এবং বেশ কিছু সংগঠিত শিল্পে নারী শ্রমিক হল সবচেয়ে সস্তা। তাই এসব ক্ষেত্রে মূল নিয়ম, কাজ না হলে পয়সা নেই। মেটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট সেখানে অচল ; নেই এমনকি ই এস আই আইনেরও প্রয়োগ। অবশ্য নামকরা সংস্থার সংগঠিত নারী কর্মচারীও অত্যাচারের ঊর্ধ্বে নন। কিছুদিন আগে CESC-তে নিয়ম চালু করা হয়েছিল — কাজে যোগ দেবার ৪ বছর বাদেই কেবল মেয়েরা মা হতে পারবেন। এবং মেটারনিটি বেনিফিট বাবাদ মাত্র ২৮ দিনের সবেতন ছুটি পাবেন। এর পর বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিবাদ, কাগজে লেখালিখি ও ঐ সংস্থার একটি ইউনিয়নের জোরাল ডেপুটেশনের পর মা হবার উপর নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা কমিয়ে করা হয়েছে ২ বছর, আর সবেতন ছুটি বেড়ে হয়েছে ৮ সপ্তাহ। অথচ আইনে বলা আছে ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটির কথা।

অবশ্য '৬১ সালের প্রণীত মেটারনিটি বেনিফিট আইনেই বলা আছে — কাজে যোগ দেবার ৩৬০ দিন বা ১ বছরের ভিতর মা হলে সেই কর্মী এই আইনের সুযোগ পাবেন না। নারী অধিকার রক্ষার নামে আইন করে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ও জন্মগত অধিকারে সরকারি হস্তক্ষেপের এই হল নমুনা।

ই এস আই ও মেটারনিটি বেনিফিট

এবার আসা যাক শিল্প শ্রমিকের ক্ষেত্রে মেটারনিটি বেনিফিটের আলোচনায়। সংগঠিত শিল্প শ্রমিকের জন্য সারা দেশে চালু ই এস আই এ্যাক্ট। এই আইনের ভিতর একটি বেনিফিট বা সুবিধা হিসেবে রয়েছে মেটারনিটি বেনিফিট, যার মান আগে বলা মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্টের অনুসারী অর্থাৎ গর্ভকালীন ১২ সপ্তাহ ও গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ৬ সপ্তাহ সবেতন ছুটির ব্যবস্থা। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্য কয়েকটি প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই সরকারি কর্মীদের মেটারনিটি বেনিফিট হিসাবে ১২ সপ্তাহের জায়গায় ১৬ সপ্তাহের সবেতন ছুটির ব্যবস্থা চালু করেছেন। কিন্তু শ্রমিকের চাঁদায় চলা শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ই এস আই আইনে আজ অবধি কোন তরফ থেকে কোনও পরিবর্তনের দাবিও ওঠেনি।

এবার দেখা যাক মেটারনিটি বেনিফিটের আর্থিক হিসেবটা। যদি ধরে নেওয়া যায় গর্ভ ও শিশুজন্মদানের মতন দরকারি সামাজিক কাজ করার জন্য মহিলা শ্রমিকের আর্থিক ক্ষতি পুরণ করা মেটারনিটি বেনিফিটের উদ্দেশ্য তাহলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে ই এস আই যে হিসেবে বেনিফিট দিচ্ছে তা নারী শ্রমিকের মোট আর্থিক ক্ষতির একটা ছোট্ট ভগ্নাংশ মাত্র। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা(ILO) দক্ষিণ ভারতে চা শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে একজন মহিলা শ্রমিকের গর্ভাবস্থা, প্রসব, শিশুর দেখাশোনা ইত্যাদি বাবদ মোট খরচ হয় — গড়ে ১৩,৪৭৫ টাকা।

১. মাইনে বাবদ ক্ষতি	গড়ে	২০২৫ টাকা
২. প্রসব পূর্বে ও প্রসবোত্তর ব্যয়	,,	২৫০ টাকা
৩. ৬ বছর অবধি শিশুর অসুস্থতা খাতে খরচ	,,	৩০০ টাকা
৪. শিশুর দেখাশোনা বাবদ		
(ক) ১ বছর পর্যন্ত	,,	৫৫০ টাকা
(খ) ২—৫ বছর পর্যন্ত	,,	৫১০০ টাকা
(গ) ৬—১৫ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয়	,,	৯০০ টাকা
৫. মায়ের অনুপস্থিতিতে শস্য হানি	,,	২৬০০ টাকা
৬. ঐ সময়ের জন্য মূল শ্রমিকের বদলে অন্য শ্রমিকের জন্য ব্যয়	,,	১৭৫০ টাকা
মোট		১৩৪৭৫ টাকা

এই খরচের হিসেবটা সব জায়গায় এক না হলেও, ই এস আইতে যে টাকা (১২ সপ্তাহের মূল বেতন) নারী শ্রমিক পান, সত্যিকার খরচ যে তার বেশ কয়েক গুণ সে সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ নেই। বিশেষত যেখানে শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবার জরুরি এমনকি বিনা পয়সায় টিকাদানের ব্যবস্থাটুকুও পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই কর্তৃপক্ষ চালু করে উঠতে পারেননি, পারেননি শিশুরোগ চিকিৎসার জন্য দরকারি হাসপাতাল সেবা চালু করতে। এখন কোনও শিল্পেই ক্রেশ ও নার্সারির ব্যবস্থা আর চালু নেই। কারণ ন্যূনতম ৩০ জন নারী শ্রমিক কাজ করলে শিল্প কারখানায় ক্রেশ ও নার্সারি রাখা বাধ্যতামূলক। আইনকে কাঁচকলা দেখাতে তাই এখন কোনও শিল্পমালিকই আর ২৯ জনের বেশি মহিলাকে পাকা চাকরিতে রাখেন না। এছাড়া আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি ছুতোয় মহিলা শ্রমিক ছাঁটাই তো আছেই।

মেটারনিটি বেনিফিট তাই আদতে বেনিফিট না হয়ে, হয়ে আছে মহিলা শ্রমিকের উপর আইনী পীড়ন ও আর্থিক বঞ্চনার হাতিয়ার। বঞ্চনা টাকা পয়সায় এবং বঞ্চনা সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ক্রম সংকোচনে। ১৯৯০ সালের সারা ভারতের শ্রম তথ্যের সংকলন থেকে নিচের সারণিতে বিষয়টা স্পষ্ট হবে মনে হয়।

১৯৮৭ সালের হিসাব অনুযায়ী

শিল্প	গড়ে দৈনিক নিযুক্ত মহিলা শ্রমিক	বেনিফিট দাবি করেছেন	বেনিফিট পেয়েছেন	মোট টাকা খরচ
১. বনজ শিল্প	২,৬৫,৯৭৭	২৯,২০৪	২৩,৮৭৩	৩,৫২,২৫,০০০
২. খনিজ শিল্প	২০,৯১৮	১,৭৪৩	১,৬৯১	২২,১৩,০০০
৩. বিভিন্ন কলকারখানা	২,৭৯,২১১	১,৬৬৮	১,৬৫১	৩১,৫৭,০০০

অর্থাৎ গড়ে কেউই বেনিফিট হিসেবে ১৫০০-১৬০০ টাকার বেশী পাননি।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রও আলাদা নয়। ১৯৮৯ সালের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সরকারি নথিভুক্ত মেটারনিটি অ্যাক্টের আওতাভুক্ত ৭২৬টি ইউনিটের ভিতর যে ৪১২টি সংস্থা সরকারের কাছে তাদের রিটার্ন দিয়েছিল তা থেকে দেখা যাচ্ছে ঐ বছর মোট ৭৪২৪ জন মহিলা মেটারনিটি বেনিফিট দাবি করেছিলেন, বেনিফিট পেয়েছেন ৭৩৭২ জন আর মোট টাকার পরিমাণ হল ৭৫,৮৯,১৭২ টাকা। অর্থাৎ গড়ে প্রতি জন বেনিফিট হিসাবে পেয়েছেন মাত্র ১০০০ টাকার কিছু বেশী।

প্রসূতির জন্য চিকিৎসা সেবা : পশ্চিমবঙ্গে

আর্থিক বঞ্চনার পাশাপাশি দেখা যাক ই এস আই সামাজিক সুরক্ষার আর এক অঙ্গ – ডাক্তারি সেবার চেহারা। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা কমছে, তা আমরা দেখেছি। তা সত্ত্বেও এখনও পশ্চিমবঙ্গে মোট ই এস আই-ভুক্ত মানুষের এক চতুর্থাংশ মহিলা, প্রায় ১০ লক্ষ। এঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৫ লক্ষ জন প্রজননশীল বয়সের। আর ঐ সংখ্যক মহিলার জন্য যাবতীয় চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা হবার কথা ই এস আই-এর মাধ্যমে, অন্তত ই এস আই বীমাকারীরা যখন মাসে মাসে তাঁদের গড় বেতনের থেকে ১¾ শতাংশ হারে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকারিভাবে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী গোটা পশ্চিমবঙ্গে (মোট আটটি জেলার জন্য) মাত্র ৬টি ই এস আই হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ চালু আছে আর তাতে শয্যা সংখ্যা সরকারী হিসেবে মোট ১২৭টি।

জেলা	ই এস আই হাসপাতালের নাম	সরকারি হিসাবে চালু	আসলে চালু
হাওড়া জেলা	(১) বালিটিকুরি হাসপাতাল	৪২টি শয্যা	২৫-৩০টি
	(২) উলুবেড়িয়া হাসপাতাল	২০টি শয্যা	১৩টি
২৪ পরগনা (দ)	(৩) বজবজ হাসপাতাল	২১টি শয্যা	২১টি
২৪পরগনা (উ)	(৪) কামারহাটি হাসপাতাল	৪টি শয্যা	৪টি
কলকাতা	(৫) মানিকতলা হাসপাতাল	২০টি শয্যা	২০টি
	(৬) শিয়ালদহ হাসপাতাল	২০টি শয্যা	০টি

দেখা যাচ্ছে সরকারি হিসেবের থেকে চালু শয্যার সংখ্যা অনেক কম। শিয়ালদহ হাপাতালে গত ৫ বছরে একটিও প্রসূতি ভর্তিই করা হয়নি। ই এস আই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় কোনও প্রসূতি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাই করা হয়নি। নারীর অধিকার, নারী শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার এই হল বাস্তব চিত্র, এথেকেই আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগের আদত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য অধিকারের জন্য দুই মূল আইন -- মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট আর ই এস আইয়ের আইনের মধ্যেই রয়ে গেছে নারী শ্রমিকের অধিকার খর্ব করার ব্যবস্থা। মেটারনিটি বেনিফিট আইন করে চাকরি পাবার এক বছরের মধ্যে মা হবার উপর কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখা হয়েছে। ই এস আই নারী শ্রমিককে স্বাস্থ্য বাবদ মেটারনিটি বেনিফিট নামে দিচ্ছে মা হবার সময় না পাওয়া মাইনের ভরতুকি। ই এস আইতে নেই কোনও নারী শিশু স্বাস্থ্য সেবার বন্দোবস্ত।

আইনের ফাঁক ফোকর দিয়েও চলছে বঞ্চনা। কখনও সংগঠিত শিল্প থেকে নারী শ্রমিক তাড়িয়ে, কখনও একটি শিল্প ইউনিটে ২৯ জনের বেশি নারী শ্রমিককে নিয়োগ না করে। কখনও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে CESC-র মত কায়দায় সংকোচন করা হচ্ছে মেটারনিটি বেনিফিটের আইনী পাওনা। এমনকি সরকারি আধা-সরকারি ক্ষেত্রেও আক্রমণ আসছে নারী শ্রমিক কর্মীর উপর — সেখানেও নারী শ্রমিকের নিয়োগ কমে আসছে দ্রুত, আসছে স্বাস্থ্য অধিকার সংকোচন করে নানান বেআইনী নির্দেশনামা। সংগঠিত শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যূনতম স্বাস্থ্য সুযোগও দিচ্ছে না ই এস আই। নারী স্বাস্থ্য সেবা, শিশু স্বাস্থ্য সেবা চালু করা তো দূরের কথা, চালু ই এস আই হাসপাতালেও নারী শ্রমিক রোগী হিসাবে হয়ে আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগী, তার জন্য নেই এমনকি মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, স্ত্রীরোগের আলাদা আলাদা চিকিৎসার বেড। আর এই সমস্ত আইনী বঞ্চনা, আইনকে পাশ কাটিয়ে আক্রমণ এবং আইন প্রয়োগ করার অনীহা নিরুপদ্রবে চলছে বছর বছর ধরে। পাশাপাশি শিল্প ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসা, নতুন চাকরিতে অ-মানুষিক শর্তে চাকরি করতে বাধ্য নারী শ্রমিকের পিছু হটার ছবি — ট্রেড ইউনিয়ন মহলে বিশেষ কোনও গুরুত্ব পাচ্ছে না।

শেষ নয়, শুরুর চেষ্টা হোক

নারী শ্রমিকের অধিকারের বিশেষ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষার, যে অমানুষিক ছবি দেখা যাচ্ছে তারই পাশাপাশি কিছু পাওয়া যাচ্ছে পরিবর্তনেরও কিছু ইঙ্গিত। যদিও ডান বাম কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নারীর নিজের অধিকার আর তার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নও তুলছেন না তবু তারই মাঝে কখনও কখনও কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর মত হঠাৎ প্রতিরোধ হচ্ছে। এবং CESC-তে প্রতিরোধের ফলে আংশিক হলেও পিছিয়েছে মালিক পক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠিত নারী কর্মীর জন্য মেটারনিটি বেনিফিটের উচ্চতর হার আদায় করতে নার্সেস এসোসিয়েশন যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে এবং কিছু অধিকার অর্জিত হয়েছে। আর কম বেশি নানা সংস্থায়, শিল্পে নিযুক্ত মহিলা কর্মীরা প্রশ্ন তুলছেন নারী হিসাবে প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধেও। সমস্যা হিসেবে পুরুষ প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথাও উঠছে পত্রিকার পাতায়। অতএব আরও প্রশ্ন তোলা, মতামতের, অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান শুরু করার কাজে লাগলে এই লেখাটাও একটা ছোট্ট ভূমিকা পালন করল বলে মনে করা যাবে।

শিল্পে দূষণ, দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানি

সরকারি তথ্য বনাম আসল ছবি

চিত্র তথ্য ১ ☐ দত্যি দানোর মুখোমুখি : "সেদিন ছিল বাইশে মার্চ '৯৩। জি টি রোড পেরোতেই, মিনিবাসের জানলা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঝাপটা মারল — ধুলোর ঝড়ে আকাশের রং কেমন খয়েরি মতন। বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। 'ফিলিপ্‌স্ — ফিলিপ্‌স্ — এগিয়ে আসুন।' নামটাই নড়ে বসাল! মনে পড়ে গেল আগের দিন এক দুর্গাপুরের বন্ধু বলছিলেন — 'ফিলিপ্‌স্ কার্বন মাঝখানে কিছুদিন কম ধোঁয়া ছাড়ছিল — এখন আবার যে কে সেই। জানেন তো ওরা চালাকি করছে আজকাল — ঝড় বৃষ্টি হলেই ওই ধোঁয়াগুলো প্রচুর ছাড়ে — মানে সেসময় কম লোক দেখতে পাবে তো — তাই বোধহয়!'

শরীরটা কেমন টান টান হয়ে উঠল — সেই ঝড়, সেই ফিলিপ্‌স্ কার্বন! 'আশা' নিয়ে মুখ বাড়ালাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না! মিনিবাসের বাঁ দিকের জানলার ফ্রেমে বাঁধানো সেই দানবটা! দুর্গাপুরের আকাশটা খয়েরি পাঁওটে মাখামাখি — ফিলিপ্‌স্ কার্বনের আকাশটা একেবারে কুচকুচে কালো — কারখানার যন্ত্রপাতি চিমনি সমেত বিশাল চেহারাটা আবছা হয়ে গেছে — কিন্তু ধোঁয়া-ধুলোর জাল কেটে বেরোও জ্বল জ্বল করছে কুড়ি পঁচিশটা সোডিয়াম, হ্যালোজেন আলো — চলছে উথালি পাথালি ঝড়, মেঘের গর্জন। কেটে বসানো ছেলেবেলার সেই চিত্র : ডাটার মতন চোখ — কুলোর মতন কান — মুলোর মতন দাঁত — কালো বাদলা মেঘের মতন চুল — আর সে কি গর্জন ..." — কোন পরিবর্তন ছাড়াই এক বন্ধুর ডাইরির পাতা হুবহু নকল করা হল।

চিত্র তথ্য ২ ☐ লালকমল আর নীলকমল : "ওই লালচে হলদেটে ধোঁয়াটা তো? ওই যে বললাম ডি এস পি-র!" জি টি রোড ধরে দুর্গাপুর থেকে আসানসোল-এর দিকে যেতে বাঁদিকে ভুসভুসিয়ে বেরোতে থাকা ওই রঙিন ধোঁয়া চোখকে ফাঁকি দেবে না — বহুক্ষণ ধরে, বহুদূর থেকে, দেখা যায় ওই দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা। এই সংস্থা অন্য সবের পাশাপাশি লালচে ধোঁয়া ও দূষণ দুইই সৃষ্টি করে!

ধোঁয়ার আড়াল তৈরি করায় কম যায় না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ডি পি এল মানে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডও! বন্ধুর জবানে — 'বারোই এপ্রিল দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম। অনেক দূর থেকে ডি পি এল-এর জোড়া চিমনি দেখা যাচ্ছিল। বিকেল তখন চারটে, একটা চিমনি থেকে সাদা অন্যটা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। দক্ষিণ দিক থেকে বেশ ভালো হাওয়া ছিল। ফলে দূর থেকে মনে হচ্ছিল ডি পি এল-এর উত্তর দিকে কেউ যেন একটা নোংরা বিশ্রি ছাই রং-এর চাদর দিয়ে সব কিছু ঢেকে দিয়েছে — ঘর, বাড়ি, মাঠ, ঘাট। আকাশ পরিষ্কার, তখনও রোদ আছে, কিন্তু ওই জায়গাটা কেমন যেন ময়লা, অন্ধকার গোছের।"

ডি পি এল কলোনি, সাগরভাঙ্গা, এ বি এল কলোনি, বি জোন, বেনাচিতি — সব জায়গাতেই পরিচিতদের বাড়িতে শোনা যায় একই সুর। দক্ষিণের হাওয়া বা উত্তরের হাওয়া; কখনও ডি পি এল কখনও ডি এস পি-র ধোঁয়া ঘরে ঢুকিয়ে দেয় ছাই বা ধুলোর মতন কি সব। জানলা চব্বিশ

ঘন্টা বন্ধ রাখতে হয়। গাছের পাতা, ঝোপঝাড় রং বদলায়। একজন বললেন — "কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যেমনই হোক — এ ব্যাপারে এরা ভাই-ভাই!"

আলোচনা ১ [ ] যা ঘটছে ঘটুক : এলাহি কেতাবি আইনকানুন। পাশাপাশি সরকারি সংস্থাগুলো পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার আইন নিজেরাই ভাঙছে। বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে পরিবেশ, শ্রমিক বা নাগরিকদের। এ অবস্থায় প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে বলার অধিকার সরকারের কতটা? ফলে তারাও যা খুশি করে!

'৯১-'৯২-এর 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ ওপরের চিত্রগুলোর কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে কঠিন 'প্রযুক্তির' ভাষায় লাইন কুড়ির মধ্যে দেওয়া আছে যে কত দক্ষতার সঙ্গে, নাম-না-দেওয়া খান পাঁচেক শিল্পে, দূষণ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানির বিপদ এড়ানো হয়েছে।

লজিকটা কিছুটা এইরকম — যা ঘটছে ঘটুক ; আমরা না দেখলেই হল ; না দেখলে 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ লিখতেও হবে না ; না লিখলে ঘটনাটা ঘটেইনি। পাশাপাশি তথ্য চেপে যাওয়ার আর এক নাম ক্ষমতা বাড়া ; 'সত্যি ঘটনা'-কে 'মিথ্যে রটনা' বলে চালালেই বিপদ কাটানো যায়।

... ...

চিত্র তথ্য ৩ [ ] বাঁচার তাগিদে : বদলি শ্রমিকদের একটানা ১৮০ দিন কাজ দেওয়া হয় না। তার আগেই ওঁদের 'বসা'র পালা। ১৮০ দিন হয়ে গেলেই শ্রমিকদের 'পাকা' কাজের আইনী অধিকার জন্মায়। তাতে মালিকদের খরচ বাড়ে। আবার শ্রমিকদের অধিকার বাড়া মানে তো মালিকদের ক্ষমতা কমা! ফলে কোনো মতেই ১৮০ দিন হতে দেওয়া চলে না। চট শিল্পে এই বদলি শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

পাশাপাশি চট শিল্পের অবস্থা আমরা মোটামুটি জানি। বছরে হরে-দরে দু-চার মাস নানা কারণে বন্ধ থাকতেই পারে কারখানা — লক আউট, ক্লোজার, সাসপেনশান অফ ওয়ার্ক বা কখনও চটকল ধর্মঘট ইত্যাদি।

ফলে একে বদলি শ্রমিক, তায় চটশিল্পে! এদের অভিধানে 'নিরাপত্তা' শব্দটা মুছে দিয়েছে মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারগুলো মিলে। সহানুভূতির অভাব হয় না, কিন্তু ১৮০ দিন পেরনোর আগেই ভুখা-মিছিলে পা মেলানো।

তাই, ১৮০ দিন ফুরোনোর আগেই অনেক ক্ষেত্রে চাকরি খুলে এঁরা নিজেরা নিজেদের 'দুর্ঘটনা' ঘটাতে বাধ্য হন — ইংরেজিতে বলে 'এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি'। ই এস আই ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেলেই কয়েকদিনের জন্যে 'দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতিপূরণ'। মানে চাকরি চলে গেলেও কিছু টাকা এঁদের ই এস আই থেকে পাওনা হয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে, যতদিন না এঁরা 'ফিট' হচ্ছেন।

ফলে লাইন পড়ে যায় ডাক্তারদের সামনে। কাটা, ছেঁড়া, ঘষা — যাই হোক, সার্টিফিকেট দেখায় শিল্প দুর্ঘটনা। অনেক শ্রমিকেরই প্রয়োজন হতে পারে এ যাত্রায় আরও কটা দিন 'আনফিট্' থাকার। নিজের তৈরি কাটা জায়গাটা, সোডা ও নুন দিয়ে বেঁধে রেখে ঘা তৈরি করতে হয়। যত ওষুধই পড়ুক সোডা-নুন চালালে ঘা থাকবেই। কেউ কেউ আবার কোন একটা আঙুলে কাঠ বেঁধে লম্বা করে রাখেন বেশ কিছুদিন। শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে কাঠ সরিয়ে দিলেও বেশ কিছুদিনের জন্য ওই আঙুল ঠিক মতন মোড়া বা ভাঁজ করা যাবে না — 'ফিট' না হওয়া পর্যন্ত কিছু তো পাওয়া যাবে!

বানিয়ে বানিয়ে লেখা গল্প নয়! বাউড়িয়া-চেঙ্গাইল অঞ্চলে লাডলো, কানোরিয়া, বাউড়িয়া নর্থ জুট মিল ; বালিতে বালি জুট মিল ; টিটাগড় অঞ্চলে এম্পায়ার জুট মিল ; তেলিনিপাড়া-ভদ্রেশ্বর-চাঁপদানি অঞ্চলে নর্থব্রুক ও ডালহৌসি জুট মিল — এসব অঞ্চলের বদলি শ্রমিকরা যে যে ই এস আই ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা করান, সেখানকার খবরাখবর নিলে প্রমাণ হবে যে এসবই — গল্প হলেও সত্যি!

চিত্র তথ্য ৪ ☐ **যাঁরা বেরন না, তাঁরা ঢোকেন নি :** দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট (ডি এস পি)-এ এখন আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। সেখানে আপনাদের আমাদের ঢুকতে গেলে 'পাস' করাতে হবে। জানাতে হবে ঠিকুজি-কুষ্ঠি। কিন্তু রোজ ওখানে কাজ করতে ঢুকছেন শয়ে শয়ে ঠিকা শ্রমিক, দিন মজুর। ওঁদেরও লাগে পাস। বলা হয় ১৪ নং গ্যাং পাস। সেই পাসে তিরিশ জন ঠিকা শ্রমিক ভেতরে ঢোকেন, কাজ করেন, বেরিয়ে আসেন। তাঁরা নামহীন, মুখহীন। সকলে রোজ বেরিয়ে আসেন এমনটাও নয়। দুর্ঘটনা মাঝেসাঝেই হয়। কিন্তু ঢোকার সময়ে যাঁরা পরিচয়হীন, তাঁরা বেরোলেন কি বেরোলেন না তা কে বলতে পারে। ফলে তাঁদের দুর্ঘটনা হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করাটাও অসম্ভব।

চিত্র তথ্য ৫ ☐ **দুর্ঘটনার গুরুত্ব :** রাজ্য সরকারের 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' থেকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেখা যেতে পারে

সাল	*মোট দুর্ঘটনা*	*মৃত্যু*
১৯৮৬	৮৪,৭৬৫	৫৮
১৯৮৭	৬২,১০০	৭৯
১৯৮৮	৫৪,২২৯	৭৭
১৯৮৯	৫৬,৫০৬	৪৭
১৯৯০	৪৯,৩০৮	৬১

পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে মৃত্যু বাদ দিলে বাকি দুর্ঘটনার ৭০% ঘটেছে চটশিল্পে। ১৯৯১ সালের মোট দুর্ঘটনা দেখানো হয়েছে ৩০,০০০ — এবং বলা হয়েছে '৯০-এর থেকে '৯১ সালে দুর্ঘটনা ১৯,০০০ কমে গেছে। এতটা কমার কোনো কারণ অবশ্য দেখানো হয়নি। '৮৯ আর '৯০ সালে চটশিল্পে দুর্ঘটনা ঘটেছিল যথাক্রমে ৪০,২৪০ আর ৩৪,৫৬৬। খুলোনো যন্ত্র ও ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকারি বিচারে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে কয়েকটা কারণে — যেমন কিছু কারখানার মেশিনে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ; ডাইরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিজ শিল্পে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্যে খুব খেটেছে ; কিছু মালিক উপলব্ধি করেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার তাৎপর্য — শেষে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে শুভবুদ্ধি খুব শীঘ্রই দেখা দেবে। (পৃ ১০৬)

আলোচনা ২ ☐ **পরিবেশনায় সরকার :** শ্রম দপ্তরের দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনার বহর ও স্বরূপ দেখে কেমন শরীর যেন খারাপ লাগে!

এই বাৎসরিক প্রতিবেদন পড়ে কে জানবে যে সরকারি সংস্থাগুলোতেই দুর্ঘটনার খবর চেপে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা আছে ১৪ নং গ্যাং পাস-এর মতন জঘন্য ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে। সরকারি একটা দলিল দাবি করছে যে '৯০ সালে, আগের বছরের চেয়ে ৪০% কম দুর্ঘটনা ঘটেছে — কিন্তু সেটা কিভাবে বা কেন ঘটেছে সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।

মালিক ও সরকার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, চট শিল্পটাকেই 'রুগ্ন' বানিয়ে তুলেছে। শ্রমিকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে — তাঁরা হয়ে উঠেছেন 'সূর্যাস্ত' শিল্পের শ্রমিক — 'লক আউট', 'ক্লোজার' বাংলা অভিধানে স্থান পাচ্ছে, এহেন হাজারে হাজারে ঠিকা শ্রমিক বাধ্য হয়ে 'দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে' দুটো পয়সা রোজগার করতে — সে ব্যাপারে কোনো শব্দই পাওয়া যাবে না এই প্রতিবেদনে।

এই কোনঠাসা চট শ্রমিক নিরুপায় হয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলতে বাধ্য হন কখনও কখনও। আশা থাকে, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের মোটা টাকা পাওয়ার। এই নির্মম সত্যের সাক্ষী বোধহয় প্রতিটা ই এস আই সার্ভিস ডিসপেনসারি!

এইরকম এক পরিস্থিতিতে চট শিল্পের মালিকদের শুভবুদ্ধি দেখা দেবে তাদের শ্রমিকদের শিল্পে নিরাপত্তার ব্যাপারে — সেই আশা ছাপার অক্ষরে বেরোয় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শ্রম দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে। শুভবুদ্ধির উদয় হোক ...

চিত্র তথ্য ৬ ☐ কানা মামা আর নেই মামা : সমস্ত কারখানার শিল্প নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা, দূষণ থেকে শুরু করে শ্রমিকদের পাওনা বা মালিকদের আইন ভঙ্গ করা পর্যন্ত সবকিছুই দেখেন ডাইরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিজ-এর পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টর — সারা পশ্চিমবঙ্গের জন্যে যাঁরা সংখ্যায় চল্লিশ জন।

দূষণ সৃষ্টি বা শ্রমিকদের পেশাজনিত রোগ বা বিপদ বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা অভাবের ব্যাপারে কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে নানান দণ্ডনীয় ব্যবস্থার কথা লেখা আছে আইনে। এই সমস্ত আইন ক্ষুদ্র শিল্পগুলোতেও প্রযোজ্য। কিন্তু অসুবিধে একটাই — কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র কারখানায় সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখার জন্যে কোনো ইন্সপেক্টর নেই! 'অপরাধ' আছে, 'অপরাধী'ও আছে, 'শাস্তি'ও আছে — শুধু এই গোটা ব্যাপারের দায়িত্বে কেউ নেই — খাতায় কলমেও নয়!

চিত্র তথ্য ৭ ☐ গোড়ায় গলদ : যে কোনো কারখানার লাইসেন্স-এর জন্যে প্রথমেই লাগে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে 'এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট'। সেই সার্টিফিকেট পেতে গেলে দু পৃষ্ঠার একটা ফর্ম ভরতে হয়। সেই ফর্ম-এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বোর্ডের উচ্চপদস্থ অফিসার সই করে সার্টিফিকেট দিলে তারপর লাইসেন্স এর জন্যে দরখাস্ত করা।

কোনো একটা কারখানার ক্ষেত্রে জানা গেছে এই তথ্য : ফর্ম জমা পড়েছে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে — সেখান থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট যথানিয়মে চলে এসেছে 'ডাইরেক্টরেট অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এ, যারা লাইসেন্স দেবে। খুব ছোটো একটা প্রশ্ন জাগায় ফর্মটা সই হবার পরেও ফিরে আসে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে — খোঁজ নিয়ে দেখা যায় আসলে ওই কারখানা আদপেই ক্লিয়ারেন্স পায়নি — ফর্মের প্রথম পৃষ্ঠা ঠিক আছে, কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, যেটাতে সই থাকবে, সেটা আসলে অন্য একটা কোম্পানির ফর্মের দ্বিতীয় পাতা। খুব হৈচৈ হয় কিন্তু তারপর বোধহয় যে কারণেই হোক সেই কারখানাটি খোলে।

শেষ খবর এটাই যে সেই কারখানাকে দূষণ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার — মামলাও নাকি করা হয়েছে।

আলোচনা ৩ ☐ ওঁরা সব দিকে লক্ষ রাখছেন : জনপ্রতিনিধিদের বলতে শোনা যায় — "...একটু অসুবিধে আছে। আমাদের কাছে খবর আছে, যাঁরা এ ব্যাপারে দেখাশোনা করেন তাঁরা সব দিকে লক্ষ রাখছেন — যা করার করা হবে।"

পরিবেশ দূষণ থেকে শিল্প দুর্ঘটনা; সবুজায়ন থেকে শিল্প শ্রমিকদের পেশা-জনিত অসুস্থতা; ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ থেকে শিল্প নিরাপত্তা; — ওঁরা সব দিকেই নাকি নজর রাখছেন।

বিভিন্ন ডাইরেক্টরেট-এ ইন্সপেক্টরের সংখ্যা কত? স্মোক ন্যুইসেন্স — ৪; ফ্যাক্টরিজ — ৪০; ইণ্ডাস্ট্রিজ — ২১, ই এস আই — ৯ ...। শুধু নথিভুক্ত (রেজিস্টার্ড) ১২,০০০ মতন কারখানাতে লাখ লাখ শ্রমিক ও পরিবেশ সম্পর্কে সবকিছু পরিদর্শন করে দেখার জন্যে কাঠামোটা বেশ শক্তপোক্ত!

আমরা মনে করি যতদিন না নীচের তলার সাধারণ নাগরিক ও শ্রমিকরা সচেতন হয়ে সবদিকে নজর রাখছেন, রক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছেন ততদিন এই গয়ংগচ্ছ চলবেই। — এখন এমনটা যদি হত যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এভাবেই ভাবছেন, তাহলে ভাবা যেত ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার ওপর ওঁদের আস্থা কমেছে তাই এ অবস্থা। সব

দিক দেখে মনে হয় বোধহয় এমনটা নয়। তাহলে কি ওঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না নিয়োগ করার উপযুক্ত লোক ?

এই সরকারই রাজ্যের মানুষকে উপহার দিয়েছেন একটা গোটা পরিবেশ মন্ত্রী — চাইলে আরো কিছু মন্ত্রী/মন্ত্রক জন্ম নিতেই পারে — কিন্তু প্রশ্ন হল, 'ওঁরা আসলে কোন দিকে নজর রাখছেন' ?

চিত্র তথ্য ৮ ☐ **সরকার বাহাদুর :** "'দূষণ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৩৮টি শিল্প সংস্থাকে'।

৩৮টি শিল্প সংস্থাকে দূষণ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে [বিরুদ্ধে] পরিবেশ দূষণের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী ৩৮টি শিল্প সংস্থাগুলি হল — ..."

আর্বালিক ডাইস অ্যাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট ম্যানু. কো. লি., অ্যাসিটো কেমিক্যালস, ইস্ট এণ্ড পেপার ইণ্ডাস্ট্রিজ লি., ইস্টার্ন জিলেটিন প্রা. লি., ইউনাইটেড নভেলটিস অ্যাণ্ড গ্যাস সাপ্লাই কোং, ইউনাইটেড ভেজিটেবল ম্যানু. লি., ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান রেয়ন ইণ্ডাস্ট্রিজ, ইণ্ডিয়ান রেয়ন কর্পোরেশন, উষা অটোমোবাইলস, এডুারেস্ট পেপার মিলস লি., কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড কটন মিলস, কেশোরাম রেয়ন, ক্যারিড অ্যাণ্ড কোং, গ্রেভস ফসকো, ডানবার মিলস লি., দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, নির্মলেন্দু বসু অ্যাণ্ড আদার্স, বাউড়িয়া কটন মিলস, প্রকাশ ডিসটিলারি, ভারত ব্যাটারি ম্যানু. কোং, প্রা. লি., ভারতীয় কেমিক্যালস, ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লি., ভিবডিওর কেমিক্যালস, মহালক্ষ্মী কটন মিলস, রসুই লিমিটেড, রামস্বরূপ ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পো., রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যান অফ ইণ্ডিয়া লি., রূপান্তর অ্যাণ্ড কো. অ্যাণ্ড আদার্স, রূপনারায়ণ পেপার মিলস, সুব্রিকেটিং অয়েল কোং অ্যাণ্ড আদার্স, শ্রীরামপুর ডিসটিলারি, সাইকেল কর্পো. অফ ইণ্ডিয়া, হাইড্রোকার্বন অ্যাণ্ড কেমিক্যালস অ্যাণ্ড আদার্স।

এই পুরো খবরটাই তুলে দেওয়া হল 'গণশক্তি' পত্রিকার ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৩ থেকে। শুধু তালিকাটা আমরা বর্ণ অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছি।

চিত্র তথ্য ৯ ☐ **আবার ৩৮ !** : ১৫ মে ১৯৯৩ বন্ধ হয়ে যাবে হাওড়া স্টেশন, মাঝেরহাটের মিন্ট সমেত ৩৮টা সংস্থা। অর্ডার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অপরাধ ? — গঙ্গা দূষণ।

খবরটা প্রথম হাতে এসেছে ছাপা হরফে দ্য টেলিগ্রাফ, সোমবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ এবং পরে ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকার ৪ এপ্রিল, ১৯৯৩ সংখ্যায়।

আরো আছে — এই ৩৮টা বাদ দিয়েও পশ্চিমবঙ্গের আরো ১৩৯টা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সুপ্রিম কোর্ট ওই ১৫ মে-র কয়েক সপ্তাহ পরেই। সব কটা সংস্থাই তাদের শিল্পের বর্জ্য পদার্থ প্রায় কোনো ভাবে পরিশোধন না করেই গঙ্গার বুকে ঢেলে দিচ্ছে। যেমন হাওড়া স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম-চত্বর, গাড়ি-ইয়ার্ডের নোংরা ও নর্দমার জল ছেড়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়।

সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বেরোনোর আগেকার ঘটনা এই রকম : প্রায় আট বছর আগে, ১৯৮৫ সালে শ্রী এম সি মেহেতা নামে এক সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেট একটা কেস ফাইল করেছিলেন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। ইনি পরিবেশ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ উকিল। এই আট বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে কেসটা চলছে আর এক এক করে গঙ্গা ধারের ৯৮টা শহরের প্রায় ১,৫০০ শিল্প সংস্থাকে এই কেসে জড়িয়ে নিয়েছেন শ্রী মেহেরা। এই অবস্থায় ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছেন। এই কেসে পরের শুনানি হবে ১৬ জুলাই '৯৩

নীচে একটা তালিকা দেওয়া হল (যা সংগ্রহ করা গেছে এখনও পর্যন্ত) সেই সব শিল্প সংস্থার যা ওই সুপ্রিম কোর্টের ১৭৭টার তালিকায় আছে।

১. ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, ২. ইণ্ডিয়ান পেট্রো-প্রোডাক্টস, ৩. ইসকো, বার্নপুর

ইউনিট, ৪. ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস, ৫. কোল ইন্ডিয়া, ৬. কোয়ালিটি আইসক্রিম, ৭. গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিন্ট, ৮. গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি, ৯. জয়শ্রী টেক্সটাইলস, ১০. জুপিটার ব্রিউয়ারিজ, ১১. জেনসন অ্যান্ড নিকলসন, ১২. টিটাগড় পেপার মিলস, ১৩. টাটা অয়েল মিলস, ১৪. ডাবর লিমিটেড, ১৫. দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট, ১৬. ন্যাশনাল জুট ম্যানু. কর্পো.-এর চারটে ইউনিট, ১৭. বিগুাল অ্যাগ্রো লিমিটেড, ১৮. বিড়লা জুট মিল, ১৯. বেলগাছিয়া ডেয়ারি, ২০. বেঙ্গল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস, ২১. বেঙ্গল পেপার মিলস, ২২. রসুই লিমিটেড, ২৩. রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান, ২৪. র‍্যালিস ইন্ডিয়া, ২৫. শ' ওয়ালেস পেস্টিসাইড ইউনিট, হলদিয়া ২৬. শালিমার টাওয়ার প্রাইভেট লি., ২৭. শালিমার পেন্টস, ২৮. হাওড়া স্টেশন, ২৯. হিন্দুস্তান মোটর, ৩০. হিন্দুস্তান লিভার।

চিত্র তথ্য ১০ ☐ মিছে ভয় পিছে পড়ে রয়!: সরকারি সূত্র থেকে জানা যায় যে '৯০ সালের জানুয়ারি থেকে '৯৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা কেস করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নানান শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে। অপরাধ? বার বার দুর্ঘটনা; পরিবেশ দূষণ; পেশাজনিত অসুস্থতা; দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু; ক্ষতিকর ধোঁয়া ছাড়া; শব্দদূষণ ইত্যাদি। তালিকাটা এবারও বর্ণ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

শিল্প সংস্থার নাম	*অভিযোগ*	*সরকারিভাবে কেস শুরু হয়েছে*
1. ইগনার হাউস	দুর্ঘটনা	16.12.92
2. ইন্ডিয়ান অয়েল সিড অ্যান্ড সিন্থেটিক প্রোডাক্টস	সেফটির অভাবে দুর্ঘটনা	31.08.92
3. ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং	পরিবেশ দূষণ	26.03.93
4. ঈগল ল্যাবরেটরিজ	পরিবেশ দূষণ	03.04.90
5. কাঁকিনাড়া জুট মিল	অ্যাম্বুলেন্স-এর অভাব	14.02.90
6. ক্যালকাটা পলিমারস অ্যান্ড উড ল্যামিনেটস	হেল্থ হ্যাজার্ড	27.11.92
7. কেশোরাম রেয়ন	দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যু	22.11.90
8. গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস	দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ না দেওয়া	18.06.90
9. গোপীনাথ পেপার মিল	কর্তৃপক্ষের বিপজ্জনক কাজ	24.12.92
10. জয় ইঞ্জিনিয়ারিং	দুর্ঘটনা/অসুস্থতার ক্ষতিপূরণ	05.06.91/ 08.07.92
11. জি ডি এ কেমিক্যালস	ফ্যাক্টরি আইন লংঘন	22.01.90
12. ডেল্টা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ	হেল্থ হ্যাজার্ড	15.01.93
13. তোর্সা টি কোং	পানীয় জলের অভাব	23.10.92
14. নস্কর ইঞ্জিনিয়ারিং	পরিবেশ দূষণ	12.03.93
15. পয়সা ইন্ডাস্ট্রিজ	পরিবেশ দূষণ/কর্তৃপক্ষের বিপজ্জনক কাজ	21.12.92
16. পেসটোমাইজ ট্রেড ইমপেক্স	বায়ুদূষণ	18.06.92
17. প্লাস্টিক প্রসেসিং ইউনিট	ক্ষতিকারক ধোঁয়া ছাড়া	25.04.91
18. বি এম জি ফার্মাসিউটিক্যালস	এয়ারকন্ডিশনার খারাপ হবার ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি	12.01.93
19. ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোং	দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি/দুর্ঘটনার অনুসন্ধান/যথেষ্ট সাবধানতা না	03.01.90/ 21.07.92/

দিক দেখে মনে হয় বোধহয় এমনটা নয়। তাহলে কি ওঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না নিয়োগ করার উপযুক্ত লোক?

এই সরকারই রাজ্যের মানুষকে উপহার দিয়েছেন একটা গোটা পরিবেশ মন্ত্রী — চাইলে আরো কিছু মন্ত্রী/মন্ত্রক জন্ম নিতেই পারে — কিন্তু প্রশ্ন হল, 'ওঁরা আসলে কোন দিকে নজর রাখছেন'?

চিত্র তথ্য ৮ □ সরকার বাহাদুর: "'দূষণ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৩৮টি শিল্প সংস্থাকে'।

৩৮টি শিল্প সংস্থাকে দূষণ সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে [বিরুদ্ধে] পরিবেশ দূষণের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী ৩৮টি শিল্প সংস্থাগুলি হল — ..."

আর্বাল্লিক ডাইস অ্যাণ্ড ইন্টারমিডিয়েট ম্যানু. কো. লি., অ্যাসিটো কেমিক্যালস, ইস্ট এণ্ড পেপার ইণ্ডাস্ট্রিজ লি., ইস্টার্ন জিলেটিন প্রা. লি., ইউনাইটেড নভেলটিস অ্যাণ্ড গ্যাস সাপ্লাই কোং, ইউনাইটেড ভেজিটেবল ম্যানু. লি., ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান রেয়ন ইণ্ডাস্ট্রিজ, ইণ্ডিয়ান রেয়ন কর্পোরেশন, ঊষা অটোমোবাইলস, এভারেস্ট পেপার মিলস লি., কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড কটন মিলস, কেশোরাম রেয়ন, ক্যারিড অ্যাণ্ড কোং, গ্রেভস ফসকো, ডানবার মিলস লি., দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, নির্মলেন্দু বসু অ্যাণ্ড আদার্স, বাউড়িয়া কটন মিলস, প্রকাশ ডিসটিলারি, ভারত ব্যাটারি ম্যানু. কোং. প্রা. লি., ভারতীয় কেমিক্যালস, ভেজিটেবল প্রোডাক্টস লি., ভিবজিওর কেমিক্যালস, মহালক্ষ্মী কটন মিলস, রসুই লিমিটেড, রামস্বরূপ ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পো., রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যান অফ ইণ্ডিয়া লি., রূপান্তর অ্যাণ্ড কো. অ্যাণ্ড আদার্স, রূপনারায়ণ পেপার মিলস, লুব্রিকেটিং অয়েল কোং অ্যাণ্ড আদার্স, শ্রীরামপুর ডিসটিলারি, সাইকেল কর্পো. অফ ইণ্ডিয়া, হাইড্রোকার্বন অ্যাণ্ড কেমিক্যালস অ্যাণ্ড আদার্স।

এই পুরো খবরটাই তুলে দেওয়া হল **'গণশক্তি' পত্রিকার ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৩ থেকে।** শুধু তালিকাটা আমরা বর্ণ অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছি।

চিত্র তথ্য ৯ □ আবার ৩৮!: ১৫ মে ১৯৯৩ বন্ধ হয়ে যাবে হাওড়া স্টেশন, মাঝেরহাটের মিন্ট সমেত ৩৮টা সংস্থা। অর্ডার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অপরাধ? -- গঙ্গা দূষণ।

খবরটা প্রথম হাতে এসেছে ছাপা হরফে দ্য টেলিগ্রাফ, সোমবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ এবং পরে ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকার ৪ এপ্রিল, ১৯৯৩ সংখ্যায়।

আরো আছে — এই ৩৮টা বাদ দিয়েও পশ্চিমবঙ্গের আরো ১৩৯টা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সুপ্রিম কোর্ট ওই ১৫ মে-র কয়েক সপ্তাহ পরেই। সব কটা সংস্থাই তাদের শিল্পের বর্জ্য পদার্থ প্রায় কোনো ভাবে পরিশোধন না করেই গঙ্গার বুকে ঢেলে দিচ্ছে। যেমন হাওড়া স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম-চত্বর, গাড়ি-ইয়ার্ডের নোংরা ও নর্দমার জল ছেড়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়।

সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বেরোনোর আগেকার ঘটনা এই রকম: প্রায় আট বছর আগে, ১৯৮৫ সালে শ্রী এম সি মেহেতা নামে এক সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেট একটা কেস ফাইল করেছিলেন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। ইনি পরিবেশ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ উকিল। এই আট বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টে কেসটা চলছে আর এক এক করে গঙ্গা ধারের ৯৮টা শহরের প্রায় ১,৫০০ শিল্প সংস্থাকে এই কেসে জড়িয়ে নিয়েছেন শ্রী মেহেতা। এই অবস্থায় ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছেন। এই কেসে পরের শুনানি হবে ১৬ জুলাই '৯৩

নীচে একটা তালিকা দেওয়া হল (যা সংগ্রহ করা গেছে এখনও পর্যন্ত) সেই সব শিল্প সংস্থার যা ওই সুপ্রিম কোর্টের ১৭৭টার তালিকায় আছে।

১. ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, ২. ইণ্ডিয়ান পেট্রো-প্রোডাক্টস, ৩. ইসকো, বার্নপুর

ইউনিট, ৪. ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস, ৫. কোল ইণ্ডিয়া, ৬. কোয়ালিটি আইসক্রিম, ৭. গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া মিন্ট, ৮. গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি, ৯. জয়শ্রী টেক্সটাইলস, ১০. জুপিটার ব্রিউয়ারিজ, ১১. জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন, ১২. টিটাগড় পেপার মিলস, ১৩. টাটা অয়েল মিলস, ১৪. ডাবর লিমিটেড, ১৫. দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, ১৬. ন্যাশনাল জুট ম্যানু. কর্পো.-এর চারটে ইউনিট, ১৭. বিগুল অ্যাগ্রো লিমিটেড, ১৮. বিড়লা জুট মিল, ১৯. বেলগাছিয়া ডেয়ারি, ২০. বেঙ্গল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস, ২১. বেঙ্গল পেপার মিলস, ২২. রসুই লিমিটেড, ২৩. রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যান, ২৪. র‍্যালিস ইণ্ডিয়া, ২৫. শ' ওয়ালেস পেস্টিসাইড ইউনিট, হলদিয়া ২৬. শালিমার টাওয়ার প্রাইভেট লি., ২৭. শালিমার পেন্টস, ২৮. হাওড়া স্টেশন, ২৯. হিন্দুস্তান মোটর, ৩০. হিন্দুস্তান লিভার।

চিত্র তথ্য ১০ [.. মিছে ভয় পিছে পড়ে রয়!: সরকারি সূত্র থেকে জানা যায় যে '৯০ সালের জানুয়ারি থেকে '৯৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা কেস করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নানান শিল্প সংস্থার বিরুদ্ধে। অপরাধ? বার বার দুর্ঘটনা; পরিবেশ দূষণ; পেশাজনিত অসুস্থতা; দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু; ক্ষতিকর ধোঁয়া ছাড়া; শব্দদূষণ ইত্যাদি। তালিকাটা এবারও বর্ণ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

শিল্প সংস্থার নাম	*অভিযোগ*	*সরকারিভাবে কেস শুরু হয়েছে*
1. ইগনার হাউস	দুর্ঘটনা	16.12.92
2. ইণ্ডিয়ান অয়েল সিড অ্যাণ্ড সিন্থেটিক প্রোডাক্টস	সেফটির অভাবে দুর্ঘটনা	31.08.92
3. ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং	পরিবেশ দূষণ	26.03.93
4. ঈগল ল্যাবরেটরিজ	পরিবেশ দূষণ	03.04.90
5. কাঁকিনাড়া জুট মিল	অ্যাম্বুলেন্স-এর অভাব	14.02.90
6. কাশীকান্টা পলিমারস অ্যাণ্ড টেক ল্যামিনেটস	হেল্থ হ্যাজার্ড	27.11.92
7. কেশোরাম রেয়ন	দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যু	22.11.90
8. গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রেস	দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ না দেওয়া	18.06.90
9. গোপীনাথ পেপার মিল	কর্তৃপক্ষের বিপজ্জনক কাজ	24.12.92
10. জয় ইঞ্জিনিয়ারিং	দুর্ঘটনা/অসুস্থতার ক্ষতিপূরণ	05.06.91/ 08.07.92
11. জি ডি এ কেমিক্যালস	ফ্যাক্টরি আইন লঙ্ঘন	22.01.90
12. ডেল্টা মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ	হেল্থ হ্যাজার্ড	15.01.93
13. তোর্সা টি কোং	পানীয় জলের অভাব	23.10.92
14. নস্কর ইঞ্জিনিয়ারিং	পরিবেশ দূষণ	12.03.93
15. পয়সা ইণ্ডাস্ট্রিজ	পরিবেশ দূষণ/কর্তৃপক্ষের বিপজ্জনক কাজ	21.12.92
16. পেসটোমাইজ ট্রেড ইমপেক্স	বায়ুদূষণ	18.06.92
17. প্লাস্টিক প্রসেসিং ইউনিট	ক্ষতিকারক ধোঁয়া ছাড়া	25.04.91
18. বি এম জি ফার্মাসিউটিক্যালস	এয়ারকণ্ডিশনার খারাপ হবার ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি	12.01.93
19. ব্রেথওয়েট অ্যাণ্ড কোং	দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি/দুর্ঘটনার অনুসন্ধান/যথেষ্ট সাবধানতা না	03.01.90/ 21.07.92/

	নেওয়ার ফলে দুর্ঘটনা	04.08.92
20. বুকবণ্ড	ফ্যাক্টরি আইন লঙ্ঘন	13.03.90
21. ভারত বোর্ড অ্যাণ্ড ড্রাম ম্যানু কোং	স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন	20.04.90
22. মেঘনা জুট মিল	অ্যাম্বুলেন্স-এর অভাব	14.07.92
23. মেটালাইজিং কর্পোরেশন	শব্দদূষণ	11.11.92
24. রেমিংটন র‍্যাণ্ড	পরিবেশ দূষণ	31.03.93
25. লাডলো জুট মিল	বায়ুদূষণ/গুদামে দূষন	05.08.92/ 05.01.93
26. সেনকোস ফুড প্রোডাক্টস	পরিবেশ দূষণ/ হেল্থ হ্যাজার্ড	24.07.92/ 11.08.92
27. স্টোন ইণ্ডিয়া লিমিটেড	ফ্যাক্টরী আইন লঙ্ঘন	05.06.90
28. স্ট্যাডমেড ইণ্ডিয়া প্রা. লি.	পরিবেশ দূষণ	19.02.93
29. হ্যানিম্যান ল্যাবরেটরিজ	পরিবেশ দূষণ	19.10.92
30. হিন্দুস্থান রাবার ইণ্ডাস্ট্রিজ	দূষণ	14.08.92

আলোচনা ৪ ☐ লাঠিও ভাঙলো না : প্রথমেই প্রশ্ন রাখা যায় এইসব বিষয়ে সরকার কেস করলে সে খবর শ্রম দপ্তর-এর 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ আসে না কেন? কোথায় আটকায়? কোন কেসে মালিকের শাস্তি হল, কোথায় সরকার হারল সে সব জানা শ্রমিক ও নাগরিকদের তো প্রয়োজন।

ফলে এগুলো সত্যিকারের কেস না লোক দেখানো — সে ব্যাপারে নজর রাখা দরকার।

আজকের যুগে পরিবেশ সচেতনতা দেখানো ভারি প্রয়োজন। দেশি বিদেশি অর্থ সাহায্য আজ আটকে যেতে পারে পরিবেশ দূষণ ইত্যাদিকে উপেক্ষা করলে। তাই, এমন যেন না হয় যে হারার জন্যই কেউ কেস লড়ছে! সাপও মরল ...

সত্যি কথা বলতে কি বিশুদ্ধ তথ্যের ওপরও আমাদের ভক্তি কম। এখানে যে একশটা মতন সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ওপর আজ নাগরিক/শ্রমিক/গণবিজ্ঞান কর্মীরা যাতে নজর রাখতে পারে, প্রচার করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই তালিকা। সব না হলেও যতগুলো সম্ভব। কাজ শুরু করার রাস্তায় এই নামগুলো কিছুটা কাজে লাগতে পারে কারণ অন্তত সরকারি খাতায় কোনো না কোনো ভাবে এরা অপরাধমূলক কাজ করছে।

চিত্র তথ্য ১১ ☐ বিষধর নদী! : দামোদর -- প্লাবনের আর এক নাম। আজ অনেকের মতে -- ভারতের সবচাইতে দূষিত নদীর নাম।

৪২টা বড় শিল্প, দূষণ সৃষ্টি করছে। আর আছে কয়লা খনি অঞ্চল আর কোল ওয়াশারীস্ (কয়লা ধোয়া হয় যেখানে)। ৪২টার ২৪টা বিহারে, বাকি পশ্চিমবঙ্গে।

দামোদরের জলে পরীক্ষা করে পাওয়া যায় তেল, গ্রীস, ফেনল্ আর বেশ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ যেমন সায়ানাইড, নিকেল, ক্রোমিয়াম, সালফাইড, ফ্লুরাইড, নাইট্রেট, আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, নানান রকম অ্যাসিড, কয়লা গুঁড়ো, ছাই ইত্যাদি।

জলবাহী রোগ, যেমন অন্ত্র বা পেটের রোগ, জন্ডিস বেড়ে চলেছে নদীর ধারের গ্রামগুলোতে — দেখা দিচ্ছে অন্য জায়গার তুলনায় বেশি ক্যানসার। চাষ-বাস-ফলন কমে চলেছে সমানে। কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা হতে চলেছেন (প্রায় অবধারিতভাবেই) লক্ষ লক্ষ মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গের যে যে শিল্প দামোদরে বিষদাঁত ফুটিয়ে চলেছে বলে মনে করা হয় তাদের তালিকাটা নীচে দেওয়া গেল :

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর কেমিক্যালস, ফিলিপস্ কার্বন, গ্র্যাফাইট ইণ্ডিয়া, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ, বেঙ্গল পেপার মিল, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোঃ, দুর্গাপুর ডেয়ারি, এ সি সি

ব্যাবকক, এ্যানুকনিন, রেকিট এ্যান্ড কোলম্যান, ক্যারিউ, সাইকেল কর্পো:, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন, ইস্ট ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস।

১৯৯০ সালে দামোদরে বোকারো স্টিল প্লান্ট থেকে ফার্নেসের তেল এসে পড়ে। লেগে যায় আগুন। সেই নিয়ে সৃষ্টি হয় বিতর্ক। সেই সময়েই প্রথম ডি ভি সি উঠে পড়ে লাগে এবং তৈরি হয় একটা কমিটি। তাতে সদস্য নেওয়া হয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেমন সেল, কোল ইণ্ডিয়া, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ফুড কর্পো:, টিসকো, ডি পি এল, সেন্ট্রাল ও বিহার পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। চেয়ারম্যান হন ডঃ বলরাম বোস, স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এ কমিটির রিপোর্ট এখনো সরকারিভাবে জানানো হয়নি।

চিত্র তথ্য ১২ [] **পাতাল প্রবেশ :** গত ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, মধ্য রাত্তিরে রানীগঞ্জের কাছে হরিশপুর গ্রামের মানুষগুলোর পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। বাড়ির দেওয়ালগুলোতে ফাটল ধরে। বিদ্যুতের পোস্ট ভেঙে পড়ে; কুড়ি-তিরিশ ফুট গভীর গহ্বর তৈরী হয় গ্রামের মধ্যে; কুয়োর জলের তল এত নেমে যায় যে সেগুলো হয়ে পড়ে শুকনো। রাস্তাগুলো ভেঙে পড়ায় গ্রাম যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূমি কেঁপেছিল ঠিকই, কিন্তু শুধু ভূমিকম্প নয়! ১৫০০ বর্গ কিমি অঞ্চলের প্রায় এক-দেড় কোটি মানুষের জীবনে মিশে গেছে এই পাতাল প্রবেশের ভয়, কে জানে কখন কি হয়!

এই রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা তোলা চলছে গত প্রায় ২২০ বছর ধরে। তৈরি হয়েছে শয়ে শয়ে কোলিয়ারি — তারা কয়লা তুলেছে আইনী-বেআইনীভাবে — ফেলে রেখে গেছে মাটির তলায় অসংখ্য ইঁদুরের গর্ত, দুশো মিটার পর্যন্ত লম্বা। কেউ জানে না ঠিক কোথায় আর কতটা গভীরে আছে সেই ফোকরগুলো। ফলে এই পুরো অঞ্চলে মাটির তলায় পাতা আছে মৃত্যু-ফাঁদ। যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি ঘর রাস্তা সমেত শয়ে শয়ে মানুষের হতে পারে জীবন্ত কবর। হড়মুড়িয়ে সব কিছু বসে যেতে বা তলিয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এইরকম ৪৫টা অঞ্চলকে বিপজ্জনক বলে দেখিয়েছে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ মাইনস্ সেফটি (ডি জি এম এস)। মনে করা হয় আজ পর্যন্ত অন্ততঃ এক-দেড় লাখ স্থানীয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

মাটি বসে যাওয়ার জন্যে ক্ষতি আরো নানা রকম হতেই পারে, হচ্ছেও। যেমন, ৪০,০০০ একর কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে; স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে নানা জায়গায়; খনি অঞ্চলের বিষাক্ত গ্যাস বেরোতেই পারে; মাটির তলার জলে মিশে যেতে পারে এমন অনেক কিছু যা পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য করে দিতে পারে; হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হয় মাটির ওপরের অংশ (টপ্ সয়েল)। সে সবই বসে বা তলিয়ে যাবে পুরোনো খনির গহ্বরগুলোতে। — এক কথায় মানুষের তৈরি এ এক পরিবেশ বিপর্যয়। '৮৯ সালে দলমতনির্বিশেষে কিছু করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। খুব শীঘ্রই সেটা কেন্দ্র-রাজ্য দোষারোপ ও দায়িত্বের প্রশ্নে ঝগড়া হয়ে ওঠে।

চিত্র তথ্য ১৩ [] **গঙ্গাসাগরও দূষিত :** '৮৯ সালের এপ্রিল থেকে '৯২ সালের অগাস্ট-এর মধ্যে হুগলি (গঙ্গা) নদীর মোহনায় কাকদ্বীপ আর হলদিয়ার কাছাকাছি জলের চরিত্র নিয়ে কাজ করেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজি রিসার্চ সেন্টার (সি এস আই আর), বোস ইনস্টিটিউট ও সেন্টার ফর স্টাডি অফ ম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট।

এই সমীক্ষার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে কিছু উদ্ভিদ জাতীয় প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়ের কারণে। এই পুরো অঞ্চলে জোয়ার ভাটা সত্ত্বেও স্নান করা খুবই বিপজ্জনক কারণ জলে ব্যাক্টেরিয়া ও পেটের পক্ষে ক্ষতিকারক জীবাণু খুব বেশী। ক্ষতি হচ্ছে এ অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের স্বাস্থ্যেরও। এও বলা হয়েছে যে গঙ্গাসাগর মেলায় আসা প্রতিটি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের জানানো উচিত যে এইখানকার জল স্নান করার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া এই অঞ্চলে বাসিন্দাদের পেটের আর চামড়ার রোগের একটা কারণ হচ্ছে গঙ্গার জলে ক্ষতিকর ভারি ধাতু ও অন্যান্য পদার্থ থাকার জন্যে। এ অঞ্চলে অন্য অঞ্চলের তুলনায় মাংসপেশী ও গাঁটের নানান অসুখ বেশি—এবং তা পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করছে জলের ম্যাঙ্গানিজ ও স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর অন্যান্য পদার্থ।

আলোচনা ৫ [] **উন্নয়ন-এর মূল্য?:** দামোদর, গঙ্গাসাগর-এর দূষণ বা রানীগঞ্জে বন্ধ-হওয়া

কয়লা খনিতে ধ্বস। সবকটাই পরিবেশ বিপর্যয়-এর চিত্র। আসলে ঘটেই চলেছে, জানাজানি হচ্ছে কম। সবকটাই যথারীতি মানুষের তৈরি — সবকটাতেই শিল্প দায়ী।

আজ নদীগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পের নর্দমা। যা প্রয়োজন নেই, যা কাছে রাখা যায় না — তাই ফেলে দাও নদীতে। নদী বয়ে নিয়ে যাবে সাগরে, আর সাগর তো অকূল!

পাশাপাশি শিল্পের চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির কাছ থেকে যা পারা যায় নেওয়াটা আজ 'মানব সভ্যতা'-র যেন অধিকার! আজকের অপরাধের শাস্তি মানুষ পাবে আগামীতে। তাই গতকালের প্রয়োজন মেটানোর নামে, কয়লা লুন্ঠতরাজ-এর খেসারত দিতে হচ্ছে আজকের রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে। তবে হ্যাঁ, খেসারতটা তারাই দিচ্ছে।

শিল্পদূষণ, শিল্পে দুর্ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে এত অযুত, এত নিযুত, লক্ষ, কোটি, হাজার — মানে কত কি সুন্দর ছাপানো আছে 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' সংখ্যা। কিন্তু 'ফাটকাবাজির উন্নয়ন'-এর মূল্য হিসেবে যে পরিবেশ বিপর্যয়গুলো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, সে ব্যাপারে পাতা নষ্ট করার আদপেই কোন প্রয়োজন বোধ করেননি 'মানুষের দিকে' থাকা এই রাজ্য সরকার।

চিত্র তথ্য ১৪ | টুকরো ছবি : ● উত্তর-পূর্ব কলকাতায় দক্ষিণদাঁড়ি-শ্রীভূমি অঞ্চলের যন্ত্রচালিত তাঁত শ্রমিকদের ওপর সমীক্ষায় দেখা গেছে ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এঁদের টি বি বা হাঁপানির চিকিৎসা শুরু করতে হয়। কে বলতে পারে এঁদের রোগটাকে হয়ত বলে বিসিনোসিস! ● বেলগাছিয়ার এন টি সি (সিগারেট) মিলে কোয়ালিটি কন্ট্রোলে বাতিল হওয়া সিগারেট-এর ফিলটার দিয়ে বিড়ির ফিলটার তৈরী হয়। ● কোনো এক সমীক্ষায় মেট্রো রেলের নিত্যযাত্রীদের শোনার ক্ষমতা কমছে বলে মনে করা হচ্ছে — কারণ জোরে মেট্রো চললে এত শব্দ হয় যে পাশের লোকের কথাও শোনা যায় না। ● গত কয়েকমাসে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে দশ জন পাথর ভাঙ্গার শ্রমিক মারা গেছেন সিলিকোসিস রোগে। পাথরে কোয়ার্টজ (সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকেট) থাকলে আর তার ধুলো নাকে ঢুকলে ফুসফুসের এক বিশেষ ধরণের রোগ হয় যাকে বলে সিলিকোসিস। ● সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিঃ সুপার ফসফেট সার কারখানা বসাতে চেয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দিরবাজার অঞ্চলে। স্থানীয় মানুষ ও বিজ্ঞানকর্মীরা রুখে দাঁড়ায়। সেই একই নামে, একই লাইসেন্স এবং একই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়ে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে কারখানা চালু হয়েছে। ● '৯২ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে চান বলে ঘোষণা করেন।

শেষের দু-চার কথা : এই লেখায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ যে ধরনের 'তথ্য' দেওয়া হয়ে থাকে তার খুব একটা মূল্য নেই। আমরা যতটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে পারি রাজ্য সরকার চাইলে তার কয়েক হাজার গুণ বেশি পারেন।

ঠিক এইখানে একটা কথা পরিষ্কার বলা দরকার যে এই বিপুল সমস্যা নিয়ে আমাদের শেষ কথা বলার মতন ক্ষমতা নেই। আমরা শুধু চেষ্টা করেছি চিত্রটা তুলে ধরতে। এই সমস্ত বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে।

বেশিরভাগ শিল্প দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দায়ী করা হয় শ্রমিকদের। বলা হয় তাদের ভুলেই দুর্ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ বা শিল্পপতিরা হয়ে যান বিচারক। আবার মাঝে মধ্যে শিল্পদূষণের কয়েকটা ক্ষেত্রে দোষ চাপানো হয় 'খারাপ' কর্তৃপক্ষ বা শিল্পপতিদের ওপর — সেখানে সরকার বিচারক। এভাবেই চলে এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে দায়িত্ব চালান করার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা কাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায়? এই প্রতিযোগিতায় কে জেতে — কে হারে?

ই এস আই মেডিকেল বেনিফিট ১৯৯২

শ্রমিকের সুরক্ষিত বঞ্চনা

এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স, সংক্ষেপে ই এস আই। রাস্তাঘাটের চালু রসিকতায় এখন তা হয়ে গেছে 'এক্সট্রা সোর্স অফ ইনকাম', উপরি আয়ের পথ। অবশ্যই শ্রমিকের নয়। শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ই এস আই সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিরক্তি, রাগ আর হতাশা আজ আপামর শ্রমিকের অনুভূতি। ঠিক এক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ই এস আই কানুন সংশোধন করে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন, এমন শ্রমিক/শিল্প কর্মচারীদের ই এস আই-এর আওতায় নিয়ে আসেন। আগে এজন্য মাসিক আয়ের উর্ধ্বসীমা ছিল ১৬০০ টাকা। স্বভাবতই অতিরিক্ত প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক/শিল্প কর্মী পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই-এর অন্তর্ভুক্ত হলেন। অতএব এমন আশা করা যেতেই পারত, যেহেতু ই এস আই অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক বীমাকারীর সংখ্যা একলাফে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে ১৩ লক্ষের উপর চলে গেল, ফলে ই এস আই-এর চাঁদা বাবদ রোজগার বাড়বে। ই এস আইয়ের, বিশেষ করে ই এস আই প্রকল্পের অন্তর্গত একমাত্র পরিষেবা মেডিক্যাল বেনিফিটের কিছুটা উন্নতি ঘটবে — এমন ভাবনাই ছিল স্বাভাবিক। আর ই এস আই-এর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নানান বিবৃতি আর আলোচনায় প্রচুর ইতিবাচক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তাই ঠিক এক বছর পর ই এস আই-এর মেডিক্যাল বেনিফিট পশ্চিমবঙ্গে কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখার এই চেষ্টা।

মেডিক্যাল বেনিফিট স্কিম : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ই এস আই-এর অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে শ্রমিক নিয়মিত চাঁদার বদলে যে ছ'টি 'সুবিধা' বা বেনিফিট পাবার অধিকারী তার পাঁচটিই হল টাকা পয়সা সংক্রান্ত।

সিকনেস বেনিফিট : অসুস্থতাকালীন আর্থিক সুবিধা, যা শ্রমিকের গড় দৈনিক রোজগারের মোটমাট ৫০ শতাংশ।

ডিসএবলমেন্ট বেনিফিট : কর্মসূত্রে শারীরিক চোট/আঘাত বা ক্ষতির জন্য। যা শ্রমিকের গড় দৈনিক রোজগারের মোটমাট ৭০ শতাংশ।

ডিপেণ্ডেন্টস্ বেনিফিট : পেশাগত কারণে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে শ্রমিকের স্ত্রী বা নির্ভরশীল পরিবার সদস্যরা যে ভাতা পাবেন। সর্বোচ্চ পরিমাণ শ্রমিকের গড় দৈনিক বেতনের মোটমাট ৭০ শতাংশ।

মেটারনিটি বেনিফিট : মাতৃত্ব বা গর্ভকালীন সুবিধা হিসাবে মহিলা বীমাকারী শ্রমিক মাতৃত্বের সময় ১২ সপ্তাহ, ও গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ৬ সপ্তাহ সবেতন ছুটি পাবেন।

ফিউনারেল এক্সপেন্স (আগে ছিল বেনিফিট) : বিনাশর্তে, বীমাকারীর মৃত্যুতে শেষকৃত্যের খরচ হিসাবে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা তার পরিবার পাবে।

এই পাঁচ রকম টাকা পয়সার সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে সবচেয়ে জরুরি সুবিধা **মেডিক্যাল বেনিফিট** বা বীমাকারী শ্রমিক ও তার নির্ভরশীল পরিবারের জন্য যে কোনও ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা। একমাত্র এই বেনিফিট বা সুবিধাটি বীমাকারী শ্রমিকের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্ব স্ব রাজ্য সরকারের শ্রম-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গে এজন্য শ্রম-দপ্তরের অধীনে রয়েছে ই এস আই (মেডিক্যাল বেনিফিট) স্কিম ডাইরেক্টরেট। রয়েছে মোট ১২টি ই এস আই হাসপাতাল, ৩১টি সার্ভিস ডিসপেনসারি, ১৪৩৫ জন প্যানেল ডাক্তার, ৫২টি রাজ্য বীমা ঔষধালয়, ৫৮টি স্বীকৃত ওষুধের দোকান। এই ছড়িয়ে-থাকা বন্দোবস্ত পরিচালনার জন্য রয়েছে ডাইরেক্টরেট অফিস, এডমিনিস্ট্রেটিভ মেডিক্যাল অফিসারের অফিস, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর। আর ১২টি হাসপাতালে আছেন সুপারিন্টেন্ডেন্টরা।

মেডিক্যাল বেনিফিট স্কিম : পরিকাঠামোর পরিবর্তন

এক বছর আগে ই এস আই কর্পোরেশনের (যাঁরা সারা ভারতে ই এস আই পরিচালন সংস্থা এবং যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা যাঁদের হাতে) দেওয়া হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ৩ লক্ষ নতুন শ্রমিক ৯২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ তিন লক্ষ লোকের জন্য চাঁদা বাবদ তাদের বেতনের প্রায় ৫.৫ শতাংশ টাকা নিয়মিত ই এস আই তহবিলে জমা হচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ঐ ৩ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের নির্ভরশীল পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ২.৮ ধরলে, মোট ৮ লক্ষ ৪০ হাজার নতুন উপভোক্তার জন্য মেডিক্যাল বেনিফিটের পরিকাঠামোর আনুপাতিক বৃদ্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বার বার নানান মহলে নানান আশ্বাসের কথা শোনান ছাড়া বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

বহির্বিভাগ : বীমাকারী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের চিকিৎসার দায়িত্ব যে প্যানেল ডাক্তার ও সার্ভিস ডিসপেনসারির উপর ন্যস্ত, সেই প্যানেল ডাক্তারের সংখ্যা ১৫০০-এর কিছু বেশী থেকে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪৩৫-এ। গত ২ বছরে একটিও নতুন সার্ভিস ডিসপেনসারি খোলা হয়নি। সার্ভিস ডিসপেনসারির সংখ্যা রয়ে গেছে ৩১টি। ফলত ই এস আই দপ্তর সরকারি সার্কুলার দিয়ে প্যানেল ডাক্তারদের নিয়ম মাফিক যেখানে ৭৫০ জন অবধি শ্রমিক বীমাকারী পরিবারের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবার কথা, সেই সীমা অনির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওরুতে এই সীমা বাড়ানর সময় সীমা ছিল ছয় মাস, কিন্তু এক বছর পরও নতুন কোনও প্যানেল চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি। স্বভাবতই ইতিমধ্যেই অকেজো (আক্রান্ত শ্রমিক ৯১-৯২ দ্রষ্টব্য) প্যানেল চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগীর আনুপাতিক হার বৃদ্ধিতে আরও অথর্ব হয়ে পড়েছে। সার্ভিস ডিসপেনসারি বা সরকারি ডিসপেনসারির হাল আরও শোচনীয়। গত একবছরে সরকারি ডিসপেনসারিতেও নতুন কোনও ডাক্তার নিয়োগ হয়নি। বরং ডিসপেনসারি থেকে চিকিৎসকরা বদলি হয়ে চলে গেছেন হাসপাতাল বা নানা প্রশাসনিক পদে। ফলে ডিসপেনসারির ১৮টি পদ এখন শূন্য। উল্টোদিকে প্যানেল ডাক্তারের তীব্র ঘাটতির ফলে — খোদ কলকাতার বুকে বেলেঘাটা সার্ভিস ডিসপেনসারি, যেখানে মাত্র ৪০০০ বীমাকারী পরিবারের চিকিৎসার জন্য পরিকাঠামো রয়েছে, সেখানে প্রায় ১২০০০ বীমাকারী পরিবারের চিকিৎসার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা উলুবেড়িয়া, গৌরহাটি, নৈহাটি ইত্যাদি সার্ভিস ডিসপেনসারিতেও। আর পরিকাঠামো বাড়ার জায়গায় এই তীব্র সংকোচনের ফলে মেডিক্যাল বেনিফিট প্রকল্পের নাভিশ্বাস উঠছে।

গত বছর ই এস আই ডাইরেক্টরেট প্রচুর হিসাবনিকাশ করে মোট ২১টি অঞ্চলের জন্য নতুন প্যানেল ডাক্তার নেবার উদ্যোগ নেয়, এই তীব্র সংকটের আশু মীমাংসার জন্য। যথারীতি চিকিৎসকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে বিজ্ঞাপন বের হয় অক্টোবর ১৯৯২তে। বেশ কিছু দরখাস্তও জমা পড়ে অক্টোবর মাসের নির্দিষ্ট শেষ তারিখের ভিতর। কিন্তু এর পর ঐ বিষয়ে এমনকি একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনাও করার উদ্যোগ কেউ নেন নি। দরখাস্ত যেমনকার তেমনই পড়ে আছে। আর সার্ভিস ডিসপেনসারি ও প্যানেল ডাক্তাররা যথারীতি কাজের ভারে ন্যুব্জ।

বিশেষজ্ঞ সেবা : বহির্বিভাগ ব্যবস্থার আর এক অংশ হল বিশেষজ্ঞ সেবা। যার ব্যবস্থা করার জন্য রয়েছে হুগলি জেলায় ২টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মানিকতলা হাসপাতালে কিছু বহির্বিভাগ, আর আটটি ই এস আই হাসপাতালে স্পেশালিস্ট সেন্টার। ৮টি ই এস আই বহির্ভূত হাসপাতালে ভাড়া করা বিশেষজ্ঞ দিয়ে চালানো হয় বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র। যদিও বিগত ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে ১২টি ই এস আই হাসপাতালেই নিজস্ব বিশেষজ্ঞ দিয়ে পুরো দস্তুর বহির্বিভাগ চালু করার প্রস্তাব তৈরি হয় ডাইরেক্টরেটে, তবু এতাবৎ কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। বাড়েনি একটিও বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র এবং বাড়তি রোগীর ভীড়ে বীমাকারী শ্রমিকের আগের মতন প্রাণান্তকর হয়রানি চলছে। উলুবেড়িয়ার অস্থি বিশেষজ্ঞ ছুটিতে গেলে উলুবেড়িয়ার রোগীকে গাঁটের পয়সা খরচ করে এ. এম. ও দপ্তর ঘুরে যেতে হচ্ছে শেয়ালদা বা বালিটিকুরিতে। ব্যাণ্ডেলের রোগীকে যেতে হচ্ছে বেলুড় হাসপাতালে। আর অধিকাংশ ই এস আই হাসপাতালেও ১২ ধরনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরামর্শ কেন্দ্র চলছে না পুরো সময়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে। কোথাও (কল্যাণী হাসপাতাল) আবার অ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে 'বিশেষজ্ঞে'র কাজ 'চালিয়ে নেওয়া' হচ্ছে। কোথাও চক্ষু চিকিৎসক চালিয়ে দিচ্ছেন শল্য চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কেন্দ্র। এ শুধু বেনিয়ম নয়, সরাসরি লোক ঠকান বন্দোবস্ত। আর তা বহাল তবিয়তে চালাচ্ছেন ই এস আই কর্তৃপক্ষ।

অন্তর্বিভাগ : গত এক বছরে ই এস আই ডাইরেক্টরেট বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রায় তিন বছর আগে থেকে খোলার কথা যে ৬ শয্যার আই সি সি ইউ (ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট) তা মাত্র মাস দুই আগে নমো নমো করে চালু করেছেন। জটিল হৃদরোগের জন্য চিকিৎসা ও পেসমেকার বসানর যাবতীয় যন্ত্র বহু লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে তার সবকটিকেই চালিয়ে দেখারও সময় হয়নি কারও। আর পেসমেকার বসানর জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষিত শল্যবিদ (থোরাসিক সার্জনের) প্রয়োজন, এমন কোনও বিশেষজ্ঞ নাকি ই এস আই-তে নিয়োগই করা হয়নি। তবু ঐ আই. সি সি ইউ ছাড়া গত এক বছরে ১২টি ই এস আই হাসপাতালে নতুন একটিও বেড বাড়েনি।

অথচ ই এস আই-এর চিকিৎসার নিয়মকানুনের কেতাব মেডিক্যাল ম্যানুয়ালের হিসাব অনুযায়ী প্রতি ১০০০ জন নতুন বীমাকারী পরিবার পিছু ৪টি করে নতুন অন্তর্বিভাগ শয্যা থাকার দরকার। অর্থাৎ ই এস আইতে নতুন আসা প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক বীমাকারী ও তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন অন্তত ১২০০ শয্যা। গত বছরে ১২টি ই এস আই হাসপাতালে মোট শয্যার সংখ্যা একটিও বাড়েনি, সংখ্যাটি রয়ে গেছে ২৯৯২। অর্থাৎ নতুন আগত শ্রমিক বীমাকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে স্বাস্থ্য সুরক্ষার নামে আইনী বঞ্চনা। শোনা গিয়েছিল ৩০০ শয্যার প্রস্তাবিত ঠাকুরপুকুর ই এস আই হাসপাতাল তাড়াতাড়ি চালু হবে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, নভেম্বরে নেওয়া সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ হাসপাতাল ই এস আই মেডিক্যাল বেনিফিট স্কিমে যোগ হবে না, চলে যাবে ই এস আই কর্পোরেশনের হাতে। কেননা ওখানে নাকি শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুসারে অকুপেশনাল ডিজিস সেন্টার বা পেশাগত রোগের পূর্ব ভারতীয় কেন্দ্র তৈরি হবে। এক দিক দিয়ে এ খবরটি ভালো, কিন্তু পাশাপাশি সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন ১২০০ শয্যা সম্বন্ধে কোনও কথা শ্রমমন্ত্রক থেকে, ডাইরেক্টরেট তথা শ্রমিক সংগঠনগুলো তুলছেন না, এটা নিশ্চয় শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তাকে জোরদার করে না।

নতুন শয্যার কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে চালু ই এস আই হাসপাতালের শয্যা নিয়েও গত বছরে বিশেষ কোনও বদল নজরে আসেনি। শ্রমমন্ত্রীর নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে কামারহাটি হাসপাতালে যে নতুন ১৫০ শয্যা বাড়ার কথা ছিল তার জন্য নানান বিভাগের বিশেষজ্ঞের অভাবে নাকি শয্যাগুলি চালু করা যাচ্ছে না। বেলুড় টিবি হাসপাতালের গোটা দেশেক বিছানায় (যা সরকারি হিসেবে 'চালু' দেখান হয়) কোনও রোগী রাখা যায় না, কারণ স্থানাভাব। বালিটিকুরি ই এস আই হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে খাতায়-কলমে ৪২টি বিছানা থাকলেও নমো নমো করে বেশি হলে গোটা ২৫ শয্যা

রোগী ভর্তি হচ্ছে — তাও মাত্র ২/৩ মাস। শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে নামকেওয়াস্তে প্রসব ঘরের (লেবার রুম) ব্যবস্থা থাকলেও গত প্রায় ৫ বছরে একজন প্রসূতিকেও ঐ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। শ্রীরামপুর, গৌরহাটি, কল্যাণী ইত্যাদি ৭টি ই এস আই হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের কোনও বন্দোবস্তই নেই। আশ্চর্যের এই, প্রতিটি ই এস আই হাসপাতালেই স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিদ্যায় শিক্ষিত বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বসে রয়েছেন।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প ই এস আই (এম. বি.) স্কিমে চোট আঘাত ইত্যাদির জন্য জরুরি (ফিজিক্যাল মেডিসিন) বিভাগ চালানর জন্য খাতায়-কলমে বন্দোবস্ত থাকলেও, গোটা পশ্চিমবঙ্গে ই এস আইতে মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক [ঐ বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এম ডি (ফিজিক্যাল মেডিসিন)] রয়েছেন। পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ বন্দোবস্ত এখনও পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি। এমনকি এ বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা (ডিপ্লোমা ইন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ্) অর্জন করার পর চিকিৎসকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন অন্য একটি ডাইরেক্টরেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার জন্য সুন্দর পরিকল্পনার এ এক অনন্য নজির। এছাড়া অর্থপেডিক্স (অস্থি রোগ), চেষ্ট (ফুসফুসের রোগ) ইত্যাদি নানান দরকারি বিভাগেরও অন্তর্বিভাগ চিকিৎসা মাঝে মধ্যেই উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ কোনও একটি হাসপাতালে না থাকার জন্য ভয়ানক রকম ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে উলুবেড়িয়া হাসপাতালের অস্থিরোগ বিভাগের বিগত কয়েকমাসের অচলাবস্থার কথা বলা যায়।

টিবি ও অন্যান্য ফুসফুসের রোগ

সরকারি তথ্য অনুসারে গত ১৯৯১-৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই-এর অধীনে গড়ে প্রতিমাসে টিবি রোগের চিকিৎসা হয়েছে প্রায় ৩০০০ রোগীর, নিউমোনিয়া-নিউমোনাইটিসের চিকিৎসা হয়েছে গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ১৭৫০ জন রোগীর ব্রঙ্কাইটিস-ব্রঙ্কিয়াকটেসিস রোগে গড়ে চিকিৎসা চলেছে প্রায় ৪৫০০০ জনের। শুধুমাত্র সংখ্যা থেকেই আন্দাজ করা যায় ফুসফুসের রোগের জন্য গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা পরিকল্পনা করে শয্যা বাড়ানো ও চালানো অত্যন্ত দরকারি। কিন্তু সম্ভবত ঐ সব পরিসংখ্যান কোনরকমে দিল্লি পাঠানো ছাড়া আর কোনও গুরুত্ব এ বিষয়ে দেওয়া হয়নি। তাই গত বছর ই এস আই বীমাকারীর সংখ্যা ৩ লক্ষ জন বাড়া সত্ত্বেও টিবির জন্য নির্দিষ্ট শয্যার সংখ্যা একটিও বাড়েনি। বেলুড়ে ই এস আই-এর অধীন একমাত্র টিবি হাসপাতালে চালু না হওয়া দশটি শয্যা এখনও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ব্যবস্থামত এবছরও শয্যা পিছু প্রতিদিন চিকিৎসা, ওষুধ ও পথ্য ইত্যাদি মিলিয়ে মাত্র ২০ টাকা হিসাবে বেসরকারি ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মোট ৬টি হাসপাতালে ৪১০টি শয্যা 'সংরক্ষণ' করা হয়েছে; যেখানে বছর বছর ওষুধের দাম লাফিয়ে বাড়ছে, বাড়ছে চাল, ডাল থেকে অন্য সব পণ্যের দাম, সেখানে ২০ টাকা প্রতিদিন হিসাবে টিবি রোগের কি চিকিৎসা চলছে ঐ সব হাসপাতালে তা সহজেই অনুমেয়। এখানে খেয়াল রাখা ভাল যে, ই এস আই হাসপাতালে গড়ে ১ জন রোগীর খাবার খরচ দিনে ১৮ টাকা। আর বেলুড় হাসপাতালে ঐ খরচ ২০ টাকার বেশি।

বেসরকারি হাসপাতালে টাকার লুঠ

অবশ্যই ঐ সব হাসপাতালের পাশাপাশি বেশি ভাগ্যবান ও অবশ্যই বেশি প্রভাবশালী একটি বেসরকারি হাসপাতালে (দরিদ্র বান্ধব গ্রুপ অফ হসপিটাল) ১২৪টি টিবি রোগশয্যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ই এস আই রোগীদের জন্য 'সংরক্ষণ করেছেন' দৈনিক শয্যা পিছু ২০ টাকা দরে এবং রোগী না থাকলেও ঐ টাকা হাসপাতালটি পাবে সরকারি হুকুম অনুসারে। জানা গেছে গত ৩ বছরে ঐ হাসপাতালে একজন ই এস আই রোগীও চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়নি। কেননা খাওয়া দাওয়া,

ওষুধ সরবরাহ এসব নিয়েই নানান অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়েছিল ঐ হাসপাতালে। এবং ই এস আই ডাইরেক্টরেট নাকি ঐ হাসপাতালেও শুধুমাত্র ভর্তি শয্যা পিছু টাকা দেওয়ারই প্রস্তাব করেছিল। তবু এই বাতিক্রম কার স্বার্থে তা সহজেই অনুমেয়। একটিও রোগীর চিকিৎসা না করেই ঐ হাসপাতাল গত তিন বছরে যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৫ হাজার, ৯ লক্ষ ৭ হাজার ও ৯ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত টাকা ই এস আই তহবিল থেকে পেয়ে গেছে। এর পর শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই এম বি স্কিমের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাও অবান্তর বলে মনে হয়।

ক্যান্সার, মনোরোগ ও অন্যান্য বিশেষ চিকিৎসা

ক্যান্সার ঃ রাসায়নিক শিল্পের বাড়বৃদ্ধি, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শ্রমিকের গড় বয়সের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে ই এস আই অধীন শ্রমিকদের ভিতর ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। স্বভাবতই শ্রমিকদের খুবই ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল ক্যান্সার রোগীর জন্য নির্দিষ্ট শয্যাসংখ্যা ২ থেকে বাড়ান। আশার কথা শয্যা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ৪০টি শয্যা সংরক্ষণের বিষয়ে কথাবার্তা সম্ভবত চূড়ান্ত হতে চলেছে। অবশ্যই ই এস আইতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

মনোরোগ : পাশাপাশি ই এস আই শ্রমিকদের মধ্যেও মনোরোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে সামগ্রিক সমাজের সঙ্গে তাল রেখে। কিন্তু এখনও বেসরকারি একটি (প্রায় অচল) হাসপাতালে মাত্র ২টি শয্যার নামকেওয়াস্তে বন্দোবস্ত, বহু দাবি সত্ত্বেও পরিবর্তনের কোনও উদ্যোগ ই এস আইতে দেখা যাচ্ছে না। সরকারি হিসেবেই ঐ ২টি শয্যার জন্যও কোনও টাকা পয়সা ১৯৯১-৯২ সালের থেকে হাসপাতালটিকে দেওয়া হয়নি; আদৌ কোনও উদ্যোগ ছিল বলেও মনে হয় না।

বিশেষ চিকিৎসা : এবার আসি বিশেষ চিকিৎসা অর্থাৎ ডায়ালিসিস, হার্ট অপারেশন, কিডনি অপারেশন, নিউরোলজিক্যাল অপারেশন ইত্যাদির কথায়। পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল বেনিফিট স্কিমের সঙ্গে এ ব্যাপারে শেঠ শুকলাল কারনানি হাসপাতালের একটি চুক্তি ছিল, যার দ্বারা ই এস আই রোগীরা নিখরচায় ঐ সব বিশেষ চিকিৎসার জন্য এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি হতে পারতেন। পরিবর্তে স্বাস্থ্য দপ্তর, শ্রম দপ্তর তথা ই এস আই ডাইরেক্টরেট থেকে খরচ-খরচা বাবদ টাকা ফেরত পেতেন। কিন্তু গত বছরের শেষে স্বাস্থ্য দপ্তর তার হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা ও অনুসন্ধান ইত্যাদির চার্জ বাড়ানর ফলে এস এস কে এম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরোন হারে আর ই এস আই রোগীদের চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছেন। কারণ আর্থিক সঙ্কট। ই এস আই রোগীদের মধ্যে যাঁদের ঐ সব চিকিৎসার প্রয়োজন তাঁদের অবস্থা অসহায়। হয় তাঁদের পকেটের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করিয়ে রি-ইমবার্সমেন্ট দাবি করতে হচ্ছে, নাহলে কপালের দোহাই দিয়ে ভাগ্য হিসাবে মেনে নিতে হচ্ছে। ই এস আই কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কাগজ চালাচালি করা ছাড়া কোনও সত্যিকারের জরুরিকালীন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। নীরব শ্রমিকের সরকারও! বাহবা সামাজিক সুরক্ষা!

পেসমেকার হার্ট ভালভ সরবরাহ : অবশ্য এত খারাপের সাথে দু'একটা ভাল খবরও আছে। গত বছরে এক বিশেষ সরকারি বন্দোবস্তে ই এস আই কর্তৃপক্ষ বহু বছরে এই প্রথম বিনা খরচে ই এস আই রোগীকে প্রয়োজনে পেসমেকার ও হৃদযন্ত্রের নকল ভালভ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। গত ১৯৯২ সালে মোট ১২ জনকে হৃদযন্ত্রের নকল ভালভ সরবরাহ করা হয়েছে, খরচ পড়েছে ৩,৮৩,৫৯৫ টাকা। আর ঐ সময়েই মোট ৪৪ জনকে সরবরাহ করা হয়েছে পেসমেকার মোট খরচ পড়েছে ১৬,২৭,৫৮১ টাকা। ই এস আই-এর অধীনে নতুন আসা ৩ লাখ শ্রমিক বীমাকারীর জন্য এটা সুখবর, তবে আশঙ্কা থেকেই যায় — এ ব্যবস্থা চালু থাকবে তো? নাকি আবার মরণাপন্ন বীমাকারীকে পকেটের পয়সা, ধার দেনা করে ঐ সব দামি যন্ত্র কিনতে হবে, আর অপেক্ষা করে থাকতে হবে বছরের পর বছর — কবে সরকার দয়া করে রি-ইমবার্সমেন্ট দেবেন।

রি-ইমবার্সমেন্ট বা চিকিৎসা ব্যয় ফেরত বন্দোবস্ত

পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই মেডিক্যাল বেনিফিট প্রকল্প ছড়ান রয়েছে আটটি শিল্পোন্নত জেলায়, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত কলকাতায় ডাইরেক্টরেট দপ্তরে। ফলে অন্যান্য সব কিছুর মতই পকেট থেকে খরচ করে চিকিৎসা চালানর পর সেই টাকা ফেরত পেতেও দরখাস্ত জমা দিতে হয় প্রকল্পের হেড অফিস ৬৪, গনেশ এভিনিউ কলিকাতা-১৩তে। আর টাকা ফেরত পেতে ন্যূনতম সময় লাগে ছয় থেকে আট মাস। তাই বিগত বছরে নাগরিক মঞ্চ সহ বহু ছোট বড় শ্রমিক সংগঠন দাবি জানিয়ে আসছিল ই এস আই প্রকল্পের বিকেন্দ্রীকরণের। অন্য কোথাও বিকেন্দ্রীকরণ না হলেও নামমাত্র বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা দপ্তরে করেছেন চিকিৎসা ব্যয় ফেরত পাবার ক্ষেত্রে। গত জানুয়ারি মাস থেকে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সবকটি সার্ভিস ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা খরচ ফেরতের জন্য দাবি জমা নেবার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রমিকদের জানাবার ব্যবস্থা এখনও করেননি প্রশাসন। দেননি কোনও নামমাত্র বিজ্ঞাপনও। ফলে কাগজে কলমে বিকেন্দ্রীকরণ হলেও খবরটাই না জানতে পাবার ফলে সেই সুবিধাটুকুও শ্রমিকরা নিতে পারছেন না। অবশ্য এতে বিরাট কিছু সুবিধা ঘটবে না, কেননা এখনও দাবির টাকা নিতে আসতে হবে কেন্দ্রীয় অফিস কলকাতায়। আর টাকা ফেরত পাওয়ার সময়ও হ্রাস পাবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খবর নিয়ে দেখা গেছে গত অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যাঁরা টাকা ফেরতের জন্য দাবি জমা দিয়েছেন, তাঁদের টাকা ফেরত পাবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

এতক্ষণ যে সব বিষয়ে আলোচনা করা গেল -- তার সবকটির থেকে বেশি সরাসরিভাবে ন্যূনতম চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত হল ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থা। এখন সে বিষয়ে একটু তাকান যাক।

ই এস আই মেডিক্যাল বেনিফিট : ওষুধ চিত্র

গত বছর বা তার আগে থেকেই যে বিষয়ে তাবৎ বীমাকারী সবচেয়ে ক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ তা হল ওষুধ সরবরাহের অবস্থা।

ই এস আই-এর মেডিক্যাল বেনিফিটের প্রধান বন্দোবস্ত হল বহির্বিভাগ প্যানেল ডাক্তার বা সার্ভিস ডিসপেনসারিতে রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা। আর হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ব্যবস্থা। এই দুই ধরনের চিকিৎসা পরামর্শেরই প্রধান অনুপান হল ওষুধ। অর্থাৎ ওষুধ সরবরাহ ঠিকমত না চললে কাগজে কলমে যে ন্যূনতম অপ্রতুল চিকিৎসা শ্রমিক ও তার পরিবার পেতে পারেন তাও নিছক পরিহাসের চেহারা নেয়।

ই এস আইতে ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থার দায়িত্ব ডাইরেক্টরেট-এর অধীনস্থ সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর-এর। এই দপ্তরের ঠিকানা হল রানী স্বর্ণময়ী রোড। সেখানে দায়িত্বে রয়েছেন একজন ডেপুটি ডিরেক্টর (ইকুইপমেন্ট ও স্টোর)। তাঁর অধীনে আছে দুজন স্টোর ইন্সপেক্টর। উপভোক্তা অর্থাৎ বীমাকারী ও তার পরিবারকে ওষুধ সরবরাহ করার জন্য রয়েছে আটটি জেলায় ছড়ান ৫২টি রাজ্য বীমা ঔষধালয় বা আর বি ও। এ রাজ্যে আর বি ও তৈরি হওয়ার আগে ছিল শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় ওষুধের দোকান বা এপ্রুভড কেমিষ্ট স্টোর। এর সংখ্যা ৫৮। ঐ সব ব্যবসায়িক ওষুধের দোকানের বদলে সরকারি আর বি ও তৈরি হওয়ার পরেও কিন্তু কেমিষ্ট দোকানের সঙ্গে চুক্তি অজ্ঞাত কারণে চালুই থেকে গেল। যদিও ঐ ৫৮টি দোকানের মধ্যে ৪৪টির ক্ষেত্রে ১—১½ কি.মি. দূরত্বের মধ্যেই নতুন আর বি ও ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে, তবুও ঐ সব দোকানের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার বন্দোবস্ত সরকার নেয়নি।

এই ৫২টি আর বি ও ও ৫৮টি নথিভুক্ত কেমিষ্ট দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করার জন্য প্রতি ২ বছর অন্তর ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে টেণ্ডারের মাধ্যমে সরবরাহকারি সংস্থা নির্বাচন ও কোন সংস্থা প্রয়োজনের কত শতাংশ সরবরাহ করবেন তা নির্ধারণের জন্য রয়েছে ই

এস. আই ড্রাগ টেণ্ডার সিলেকশন কমিটি। ১২ জনের ঐ কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও রয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন এবং চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

আপাতভাবে এই গোছাল গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কোন ই এস আই-এর ওষুধ নিয়ে নানা প্রশ্ন, তা বুঝতে গেলে প্রথমে সাধারণত যে সব অভিযোগ শোনা যায় তা দেখা যাক—

● প্রথম অভিযোগ : ই এস আইতে ওষুধ পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবু চারটি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিলে ১টা-২টোর বেশী কখনোই মেলে না।

● দ্বিতীয় : ই এস আইতে যে ওষুধ পাওয়া যায় তাতে রোগ সারে না। অর্থাৎ ওষুধ অত্যন্ত নিম্নমানের, কখনও ব্যবহারের অযোগ্য।

● তৃতীয় : ই এস আইতে ওষুধ সরবরাহ থেকে লাভ হয় শুধুমাত্র কিছু অসৎ কর্মচারী ও দালালের। এখানে চালাও চুরিটাই নিয়ম, অন্য কিছু ব্যতিক্রম।

● চতুর্থ : ই এস আই ওষুধ সরবরাহকে ঘিরে বেশ ক্ষমতাশালী এক চক্র গড়ে উঠেছে যারা ক্ষমতাশালী যোগাযোগ এবং অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকের কষ্টের পয়সা লুঠ করে যাচ্ছে।

আমাদের প্রাথমিক ধারণায় এই সব কটি অভিযোগকেই যথার্থ এবং সঠিক অভিযোগ বলে মনে হয়েছে। বিশেষত ওষুধ পাওয়া ও তার গুণগত মান সম্বন্ধে অভিযোগ সত্যি বলেই মনে করার প্রচুর কারণ আছে। দুর্নীতি ও চুরির অভিযোগ সম্বন্ধেও অনুরূপ ইঙ্গিতই পাওয়া গেছে।

প্রথমে ধরা যাক কেমিষ্ট শপ ও আর বি ও প্রথা পাশাপাশি থেকে যাবার ব্যাপারটা। ১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত ৫৮টি কেমিষ্ট দোকান মাসে গড়ে প্রায় ১০-৫০ হাজার টাকার ব্যবসা করত। অর্থাৎ কাগজে-কলমে তারা ঐ দামের ওষুধ ই এস আই-এর তালিকাভুক্ত ডিস্ট্রিবিউটারদের থেকে কিনে বীমাকারীদের ভিতর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে বিনামূল্যে দিত। কিন্তু ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কয়েকটি নথিভুক্ত বড়সড় ওষুধের দোকানের জমা দেওয়া বিল পরীক্ষা করে ই এস আই দপ্তরের কাছে এমন প্রমাণ জমা হয় যাতে বোঝা যায় যে ঐ সব কেমিষ্টরা আসলে কিছু অসৎ চিকিৎসক বা দালালের কাছ থেকে নকল প্রেসক্রিপশন কিনে তার বদলে ই এস আই থেকে মাসে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে। আরও অনুসন্ধানের ফলে এমন খবরও বের হয় যে ঐ সব ওষুধের দোকানের মধ্যে বেশিরভাগেরই ওষুধ ব্যবসা চালানর জন্যে কোনও বৈধ ড্রাগ লাইসেন্সও নেই। এমনকি অনেক ওষুধের দোকান মালিকানা হস্তান্তরের ফলে আদতে ই এস আইয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধও নয়। তবু ব্যবসা চলছে। এছাড়া ঐ সব ওষুধের দোকানের খুব কাছেই সরকারি ঔষধালয় থাকা সত্ত্বেও কেন যে ঐ সব দোকানের সঙ্গে চুক্তি আজও ই এস আই দপ্তর বাতিল করেননি তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, যদিও আইনে সেই বন্দোবস্ত আছে।

পাশাপাশি ১৯৯১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিরাট এক সংখ্যায় জলছাপ কাগজে ছাপান ই এস আইয়ের জাল প্রেসক্রিপশন ধরা পড়ে। বিভাগীয় তদন্তে ঐ সব জাল প্রেসক্রিপশন দিয়ে রাজ্য বীমা ঔষধালয় থেকে ই এস আইয়ের ওষুধ পাচার হয়ে গিয়েছিল এমন ধারণা করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। তবু আজ অবধি এ বিষয়ে ডাইরেক্টরেট অফিস, শ্রম দপ্তর তথা রাজ্য সরকারের তরফে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। স্বভাবতই ওষুধ নিয়ে দুর্নীতির যে সব অভিযোগ বীমাকারীদের মুখে মুখে ঘোরে, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু দুর্নীতির জন্যই বর্তমানে এমন দুরবস্থা তা মনে করার আগে আইনী ব্যবস্থা ও তার অধুনা হালচাল আর একটু নজর করে দেখা দরকার।

ই এস আই মেডিক্যাল বেনিফিট যেহেতু রাজ্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে, তাই এখানে কোন কোন ওষুধ বহির্বিভাগে সরবরাহ করা হবে, কোন কোন ওষুধ হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা পাবেন এমন কোন বাঁধাধরা স্থায়ী তালিকা ই এস আই কর্পোরেশন বেঁধে দেননি। ফলত নতুন করে টেণ্ডার ডাকার সময় ঐ তালিকা অনেকটাই ড্রাগ টেণ্ডার সিলেকশন কমিটির মর্জি আর খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বর্তমানে চালু ৯৯টি ওষুধের তালিকার আগে যে ওষুধ

আগে যে ওষুধ তালিকা চালু ছিল তাতে মোট সরবরাহযোগ্য ওষুধ ছিল প্রায় ৪০০। আর ঐ সব ওষুধের যে নির্ধারিত দৈনিক মাত্রা বেঁধে দেওয়া ছিল, তার বেশিরভাগই ছিল ডাক্তারি শাস্ত্রমতে ঠিক করে দেওয়া ন্যূনতম দৈনিক মাত্রার চেয়ে বেশ কম। (আমাশয়ের ওষুধ মেট্রোনিডাজোল ট্যাবলেট — ১টা করে দিনে দুবার, যেখানে সঠিক মাত্রা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ৪০০ মিগ্রা দিনে তিনবার।)

এরপর ওষুধের টেন্ডার ডাকার যে পদ্ধতি এখনও চালু আছে তাতে প্রতিটি ওষুধের টেন্ডারের সঙ্গে প্রায় ১২/১৪ রকমের সার্টিফিকেট, এপ্রুভাল, আর ক্লিয়ারেন্স-এর কপি জমা দিতে হয়। পাশাপাশি দিতে হয় ওষুধের সিল করা স্যাম্পেল ও ওষুধের টেস্ট সার্টিফিকেট। যদিও এটা প্রায় সর্বজনবিদিত যে জমা দেওয়ার পরে সরবরাহকৃত ওষুধ ভিন্ন ভিন্ন গুণমানের হয়েই থাকে। আর প্রতিটি ব্যাচের ওষুধ সরকারিভাবে টেস্ট করে ওষুধের গুণমান পরীক্ষার কোনও ন্যূনতম ব্যবস্থাও ই এস আই কর্তৃপক্ষ এখনও করে উঠতে পারেননি। অতএব যেন তেন প্রকারেণ একবার টেন্ডার পেয়ে গেলে গুণমান বজায় রাখার কোনও মাথাব্যথা ব্যবসায়ীদের না থাকারই কথা।

এদিকে টেন্ডার ডাকার সময় কোনও একটি ওষুধের সম্ভাব্য ক্রয়ের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়ার রীতিও ই এস আই অনুসরণ করে না। বর্তমানে যে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে তাতে ১৫৪ রকম ওষুধের জন্য টেন্ডার ডাকা হলেও মাত্র ৬৩ রকম ওষুধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয়-এর পরিমাণ জানান হয়েছে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ওষুধ প্রস্তুত করে ব্যবসা করা বড় ওষুধ কোম্পানীগুলো প্রতিটি ওষুধের জন্য পরিশ্রম করে ঠিকঠাকভাবে টেন্ডার ভরার উৎসাহ পান না বলে সকলের ধারণা। আর এতে সুবিধা হয় কাগুজে অস্তিত্বওয়ালা ওষুধ ব্যবসাদারদের, বিশেষত যদি ঠিকঠাক যোগাযোগ থাকে ঠিক জায়গায়। ফলে এমন ঘটনা গত ২ বছরে প্রায়ই হয়েছে যে টেন্ডার মনোনীত হবার পর অর্ডার মত মাল মহ কোম্পানিই সরবরাহ করেনি। কেননা অনেক ক্ষেত্রে শোনা যায় টেন্ডার প্রাপকের ওষুধ বানাবার ন্যূনতম যন্ত্রপাতিও থাকে না। সবটাই ধার করে আর ছাপ মেরে চলে।

এর সাথে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভেষজ নীতির পরিবর্তনের প্রভাব, যার ফলে ওষুধের দাম দ্রুত বেড়ে চলেছে। ওষুধ তৈরির মূল অনুপানের দাম বাড়লে, বড়ি ক্যাপসুলের দামও বাড়ার কথা, কিন্তু আগে দাম সংক্রান্ত চুক্তি করে ফেলে আর পুরোন দামে ওষুধ সরবরাহ করতে কোম্পানিগুলো পারছে না, তারা তো লাভের জন্যই ব্যবসা করছে।

আর্থিক ব্যবস্থা : দামের প্রশ্ন এলেই চলে আসে ওষুধ খাতে ই এস আই-এর ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্ন। ই এস আই চলে শ্রমিক ও মালিকের দেয় চাঁদার উপর ভিত্তি করে। শ্রমিক দেয় গড় বেতনের ১.৫ শতাংশ, মালিক শ্রমিক পিছু দেয় বেতনের ৪ শতাংশ। ঐ মোট পরিমাণ চাঁদার আকারে জমা পড়ে ই এস আই কর্পোরেশন তহবিলে। ঐ তহবিল থেকে প্রতি বীমাকারী পরিবার পিছু মেডিক্যাল বেনিফিট খাতে বছরে রাজ্য সরকার পায় ৩৪৫ টাকা। এর ভিতর ২৪৫ টাকা সাধারণ চিকিৎসা বন্দোবস্তের খরচ খাতে এবং ১০০ টাকা প্রতি বীমাকারী পরিবার পিছু ঔষধ খাতে খরচ বাবদ। এর থেকে বেশি খরচ হলে তা বহন করতে হয় রাজ্য সরকারকে। ১৯৮৩ সালে ঔষধ খাতে ধার্য ছিল পরিবার পিছু বার্ষিক ৫৫ টাকা। অতএব ই এস আই কর্পোরেশন ১৯৯৩তে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার পুস্তিকা বার করেছে চিকিৎসা খাতে খরচ 'বহুল পরিমাণে বাড়ানর' খবর দিয়ে। কিন্তু ওষুধের দাম, কেন্দ্রীয় নীতি ও নয়া আর্থিক বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে বেড়েছে ক্ষেত্র বিশেষে প্রায় তিনগুণ। আর সেক্ষেত্রে ঔষধ খাতে খরচ দ্বিগুণও বাড়েনি — শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা মার্কা গালভরা নামের প্রকল্পে। এই সরাসরি বঞ্চনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ই এস আই তহবিলে মোটা টাকার বার্ষিক মুনাফা জমা হবার ঘটনা দেখতে বুঝতে অসুবিধে থাকে না ই এস আইতে শ্রমিকের সামাজিক শোষণের বন্দোবস্তই সুরক্ষিত — আইনের মারপ্যাঁচে। পাশাপাশি খেয়াল রাখা যেতে পারে,

'৯১-৯২ সালে রাজ্য সরকার শ্রমিক পরিবার পিছু খরচ করেছেন মোট ২৯৯ টাকা। সাধারণ চিকিৎসা বাবদ ২৩৫ আর ওষুধ খাতে পরিবার পিছু মাত্র ৬৪ টাকা। কর্পোরেশনের আইনি বঞ্চনার পরও অবশ্য প্রশ্ন থাকেই যে রাজ্যের সাধারণ প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারের, যে রাজ্য সরকার শ্রমিকের সরকার পরিচিতিতে চিহ্নিত — তার দায়িত্ব শুধু আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আটকে যাবার কথা নয়, যদি সদিচ্ছা থাকে। কারণ ই এস আই-ভুক্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যের জন্য সরকারি তহবিল থেকে খরচ হয় না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য খাতে যে খরচ হবার কথা তা অনায়াসেই ই এস আইতে খরচ করতে পারার কথা, অন্তত সাধারণ যুক্তিতে তাই সঠিক বলে মনে হয়।

অবশ্যই আমাদের যুক্তি এবং শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার, ঠিকাদার ই এস আই ডাইরেক্টরেট-এর বিচার এক নয়। তাই গত ১৩ই জুন '৯২ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আইন কানুন ভেঙে প্রায় ২ কোটি টাকার ওষুধ কেনার কথা — পশ্চিমবঙ্গে ই এস আই-এর জন্য। ঐ পত্রিকার মতে ঐ ২ কোটি টাকার ওষুধের অনেকটাই অকারণে কেনা হয়েছিল, যার বেশ কিছু ওষুধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পড়ে থেকে। আর ঐ ২ কোটি টাকার ওষুধ কেনার সুবাদে জনৈক ওষুধ ডিস্ট্রিবিউটার প্রায় ৫০ লাখ টাকা বাড়তি লাভ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঐ সব গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে শেষ অবধি রাজ্য শ্রম দপ্তরকে বিভাগীয় তদন্ত করার নির্দেশও দিতে হয়েছে। তবে সব সরকারি তদন্তের মতই এই তদন্তেরও কোন ফল অন্তত শ্রমিকদের জানার কোনও সুযোগ হবে বলে মনে হয় না, যদিও শ্রমিকের টাকাতেই ই এস আই চলে।

আনন্দের কথা এত বড়সড় ঘটনার পর রাজ্যের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের কোনও কোনও নেতা, ই এস আই-এর ওষুধ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিস্থিতির প্রতি অসন্তোষ মাঝে মধ্যে প্রকাশ করছেন। আর তারই ফলে গত নভেম্বরে ভারতের পূর্বাঞ্চলের জন্য ই এস আই রিজিওনাল বোর্ডের সভায় শ্রমমন্ত্রীকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আশ্বাস দিতে হয় যে ওষুধ সরবরাহের উন্নতি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এবং ওষুধ না পাবার ব্যাপারে মূল কারণ হল — টেন্ডার ও সরবরাহ চূড়ান্তকরণের জটিলতা। কিন্তু নভেম্বর মাসে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাস দেওয়ার পরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি।

ওষুধ সরবরাহ চিত্র : সমীক্ষা

ই. এস. আই-তে ওষুধ সরবরাহের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে ১১টি রাজ্যবীমা ঔষধালয় ও বেশ কিছু প্যানেল ডাক্তার এবং সার্ভিস ডিসপেনসরিতে গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সমীক্ষা চালান হয়েছিল। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ঐ ১১টি রাজ্য বীমা ঔষধালয়ে ঐ সময় মাসে গড়ে ৪৮ ধরনের ওষুধ সেন্ট্রাল স্টোর থেকে চাওয়া হয়েছিল। সরবরাহ পাওয়া গেছে গড়ে মাত্র ৩২ ধরনের ওষুধ, আর তার মধ্যে আবার গড়ে ৫ রকমের ওষুধ নামমাত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে খেয়াল রাখার দরকার বর্তমানে ই এস আই-তে যে ৯৯ টি ওষুধের তালিকা চালু আছে তা হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বানানো জরুরি ওষুধের তালিকার ১৭৮ টি ওষুধের মধ্য থেকেও বাছাই করা অতীব দরকারি ওষুধের তালিকা। এবং তাই এর ভিতর একটি ওষুধও না পাওয়ার অর্থ শ্রমিকের পয়সায় চলা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার নামে চিকিৎসার বদলে ধোঁকাবাজি। আরও মজার কথা হল সমীক্ষায় এও দেখা গেছে যে প্রায় কোন রাজ্য-বীমা ঔষধালয়েই ঐ সময় লাগাতার (অর্থাৎ মাসের সব দিন) এমনকি টিবির ওষুধও সরবরাহ করা হচ্ছিল না। এখানে খেয়াল করা যেতে পারে ই এস আই-তে গড়ে মাসিক প্রায় ৩০০০ টিবি রোগীর চিকিৎসা চলে। অর্থাৎ অনিয়মিত ওষুধ সরবরাহ করে ৩০০০ টিবি রোগীকে ড্রাগ রেসিসটান্ট করে তোলার সুন্দর ব্যবস্থা ই এস আই-তে চলছে সামাজিক সুরক্ষার নামে। কোনও রকম আর্থিক অসঙ্গতির দোহাই দিয়েই এই অপরাধের স্খালন করা যায় না।

সার্ভিস ডিসপেনসারিগুলিতেও অবস্থা একই রকম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে সেন্ট্রাল

মেডিক্যাল স্টোর থেকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি ধরনের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলত বহির্বিভাগের রোগীদের অবস্থা শোচনীয়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাবার্তায় আরও চমকপ্রদ কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। চিকিৎসকদের সাধারণভাবে মতামত -- ঐ ৯৯ টি ওষুধের তালিকায় যে যে ওষুধ আছে তা দিয়ে এমনকি সাধারণ মানের একটা বহির্বিভাগ ব্যবস্থাও টিকিয়ে রাখা যায় না। ঐ তালিকায় কাশি বন্ধের জন্য একমাত্র যে কোডিন ট্যাবলেট রাখা হয়েছে তা কোন আর বি ও-তেই পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ চিকিৎসকের মত এ্যান্টিসেপটিক মলম ছাড়া সাধারণ কাটা ছেঁড়ার চিকিৎসাও চলে না। অথচ ঐ তালিকায় তাও নেই। নেই চামড়ার নানান ধরনের অসুখ, চোখ, নাকের নানা অসুখের জন্য অতি দরকারি মলম, ড্রপ ইত্যাদি। নেই এর তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা যায় -- আর ঐ ৯৯ টি ওষুধের তালিকাটা যে যথেষ্ট নয় তা প্রকারান্তরে ই এস আই কর্তৃপক্ষ ৯৯ টা ওষুধ তালিকার গল্প বারবার শোনালেও গত জুলাই মাসের ৩১ তারিখে জারি করা একটি বিভাগীয় আদেশনামার কপি আমাদের হাতে এসেছে যাতে ঐ ৯৯ টি ওষুধের তালিকা সবার জ্ঞাতার্থে পাঠানর সময়ই বলা হয়েছে যে ঐ ৯৯ টির মধ্যেও আবার ১৭ ধরনের ওষুধ আপাতত সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর থেকে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ আদতে ই এস আই প্রকল্পে চিকিৎসা চলছে এখন মোট ৮২ ধরনের ওষুধ দিয়ে। সারা পৃথিবীতে যে কোনও দেশের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ইতিহাসে সম্ভবত এ এক অনন্য রেকর্ড।

রোগের পিছনে : সঠিকভাবে মেডিক্যাল বেনিফিটের অপ্রতুলতা ও বিশেষ করে ওষুধের ক্ষেত্রে এই ভয়ানক রকম কৃপণতা ও শ্রমিকের ন্যূনতম চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে পারার মতন ওষুধ ই. এস. আই-তে না থাকার কারণ হিসাবে ই এস আই কর্পোরেশনের আর্থিক বঞ্চনার কথা আসবেই। একথা সত্যি যে ই এস আই কর্পোরেশনের সর্বভারতীয় তহবিলের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসেবে -- গড়ে বছরে প্রায় ১২৩ (১৯৮৯-৯০) কোটি টাকা "উদ্বৃত্ত" হয়। পাশাপাশি সারা ভারতে মেডিক্যাল বেনিফিট অর্থাৎ চিকিৎসা খাতে মোট ব্যয় হয় ১৫৬ কোটি টাকার কিছু বেশি (১৯৮৯-৯০) আর অন্যভাবে দেখলে কর্পোরেশনের মোট খরচের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যায় তার অফিস ও কর্মীদের পিছনে। এবং শ্রমিকের ফেরত দেয় মোট ব্যয়ের মাত্র ২০.৬১ শতাংশ। অর্থাৎ ওষুধ তথা সামগ্রিক চিকিৎসা খাতে ব্যয় যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ২১৫ টাকায় বেঁধে রেখে বছর বছর কোটি কোটি টাকা যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ২১৫ টাকায় বেঁধে রেখে বছর বছর কোটি কোটি টাকা মুনাফা জমা করা -- শ্রমিকের প্রতি চরম ধোঁকাবাজি। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও চিকিৎসা তথা মেডিক্যাল বেনিফিটের নামে শুধু টাকা বাঁচানোর জন্য একদিকে অবৈজ্ঞানিকভাবে ওষুধ সরবরাহের পরিমাণ ও মোট সরবরাহকৃত ওষুধের সংখ্যাকে কমিয়ে দেওয়া কোন যুক্তিতেই শ্রমিক স্বার্থের ধারক বাহক হতে পারেনা। এমনকি এ কাজ শ্রমিকের সমর্থনপুষ্ট সরকারের শ্রম দপ্তর করলেও নয়। বিশেষত যেখানে পাশাপাশি চলছে প্রচুর অপচয়, অবান্তর ব্যয়, পরিকল্পনার অভাবে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক বসে আছেন, অন্যদিকে ডাক্তারের অভাবে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে চিকিৎসা ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে শ্রমিককে। একদিকে চলছে লাখ লাখ টাকা খরচ করে দামি যন্ত্র কেনা, আর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের অভাবে পড়ে নষ্ট হচ্ছে সেই যন্ত্র। আর বি ও-তে টিবির ওষুধের হাহাকার, আর সেন্ট্রাল স্টোরে পড়ে পচছে বহু টাকার এন্টিবায়োটিক আর খাবার স্যালাইনের প্যাকেট।

এই চালচিত্র চোখে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়, আর্থিক অসঙ্গতি আর কর্পোরেশনের মুনাফাবাজি নিরপেক্ষভাবেই পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই মেডিক্যাল বেনিফিট প্রকল্প -- শ্রমিকের হয়রানি আর বঞ্চনার ব্যবস্থাকেই সুরক্ষিত করছে। সুরক্ষিত এখানে শ্রমিকের বঞ্চিত হবার অধিকার -- প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক হরেক কায়দায়।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

বেড়েই চলেছে বকেয়ার তালিকা

কলকাতা পুরসভার বড়বাবু শ্যাম চাটুজ্যে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। বরানগর জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় আলাউদ্দিনের মত আরও অনেক শ্রমিককেই অবসর নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। গৌরীশঙ্কর জুট মিলের শান্তি দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ১৯৯০ সালের ২১ সেপ্টেম্বরে। ঐ দিনই পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হয় চটকল শ্রমিক রাজেশ্বর রাইয়ের। বকেয়া পি এফ, গ্র্যাচুইটির দাবি তুলেছিলেন রাজেশ্বররা। ৮০ সালে অবসর নিয়েও বকেয়া প্রাপ্য হাতে পান নি শান্তি দেবী। শান্তি দেবী থাকেন মিলের কুলি লাইনে। আর 'বাবু লোক' দেখলেই পেড়ে বসেন তাঁর দুঃখের কাহিনী।

সরকারি কিংবা বেসরকারি মালিক সে যাই হোক, অবসর, ছাঁটাই বা মৃত্যুর পর পি এফ-এর টাকা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। সারা রাজ্যে এই একই চিত্র।

এ রাজ্যের শ্রমিকদের অবস্থা ও শিল্পের হাল হকিকতের খবর যাঁরা রাখেন, সবাই জানেন গ্র্যাচুইটি, পি এফের ব্যাপারে শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা। তবুও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংগঠনটির বার্ষিক প্রতিবেদনে সাফল্যের সাফাই গাওয়া হয় বিস্তর। পি এফ সংগঠনটির কাজকর্মের জন্য হাজার হাজার কর্মচারী কার্যত টাকা জমা দিয়ে ফেরত পান না, প্রয়োজনের সময়ে হাতে পান না নিজেরই সঞ্চিত অর্থ। মালিকরা দিনের পর দিন শ্রমিকদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া অর্থ পি এফ তহবিলে জমা না দিয়ে বিভিন্ন আইনের ফাঁক দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। এমনই একটা ছবি ভুক্তভোগী সবার মনে বেদনার ও ক্ষোভের সাথে গেঁথে আছে।

'আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' কমিশনারের (৯১-৯২) প্রতিবেদন যেটা 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ (১৯৯২) মুখ্য তথ্য হিসাবে প্রকাশিত হবে তাতে বলা হয়েছে, ৯১-৯২ সালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পি এফ সংগঠনটির কাজ এমন হয়েছে যা নাকি গত বিশ বছরে সম্ভব হয়নি। কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা এমন 'কেজো' নমুনা অবশ্য খুব বেশি পাইনি। গত বছর পি এফ সংগ্রহে সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে ; ১৪০ কোটি টাকা জমা পড়েছে তহবিলে (৯০-৯১ সালে ১২২ কোটি ছিল)। এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব জায়গায় ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (ই পি এফ) সংস্থাটির অকর্মণ্যতার। যদিও কমিশনার তাঁর প্রতিবেদনে স্বীকার করেছেন, রাজ্য পি এফ সংস্থাটির কাজের কতটুকু উন্নতি হয়েছে সংশ্লিষ্ট বছরে, তা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাতত্ত্বেই প্রমাণ হবে।

একজন পি এফ অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক কর্মচারীর কাজের উন্নতি বুঝবেন কি ভাবে?

▶ প্রথমত: পি এফ-এর ধার চেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পেয়েছেন কিনা।

▶ দ্বিতীয়ত: শ্রমিক কর্মচারীদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া টাকা পি এফ তহবিলে জমা পড়ছে কিনা।

▶ তৃতীয়ত: পি এফ-এর বকেয়া টাকা আদায়ে মালিকদের ও ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

▶ চতুর্থতঃ মৃত্যু, মেয়ের বা আত্মীয় স্বজনের বিয়ে, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও অন্যান্য প্রয়োজনে দাবি জানিয়ে সময়মত টাকা পেয়েছেন কিনা।

▶ পঞ্চমতঃ টাকা জমা দেওয়ার কতদিন পরে 'স্লিপ' বা হিসেবের কাগজপত্র কর্মচারীরা পাচ্ছেন।

নমুনা ☐ ১. আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পি এফ) সাফল্য (১৯৯১-৯২)

মোট দাবি (Claims) জমা পড়েছিল ৫০,৯৭১
কর্মচারীরা পেয়েছেন ৪৬,১৫৯
ই পি এফ কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মচারীদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫৭,৯৯৬। মীমাংসা হয়েছে ৫০,৯৭১টি।

সাল	বকেয়া	মোট দাবি	মীমাংসা হয়েছে	ফেরত গেছে	দেওয়া হয়েছে কোটি টাকায়
১৯৯০-৯১	৭৩১৯	৫২৬০৩	৪৬১৫৭	৬৬১০	৬৯.২১
১৯৯১-৯২	৭১৫৫	৬১৮৬০	৫০৯৭১	৬৭৭৪	৭৩.৫৮

দাবির প্রকৃতি কেমন ৯১-৯২

	মোট দাবি	মোট টাকা (লক্ষ)
মৃত্যু	৭,৯৭০	১,১৬৫.৭১
ইস্তফা	২০,১৩১	২,৭৩৫.৬২
ছাঁটাই	১০,০৪৬	১,২১২.৩০
অক্ষম	১,৪৭২	২৬৬.৬৪
অন্যান্য	১,৫৪৩	২৭৮.০০
		৭,৩৫৮.২৭

মৃত্যুর খরচ বাবদ পি এফ থেকে ধার পেয়েছেন ২০ জন ১৬,৩৩৪ টাকা। **এখানে লক্ষণীয় গত বছরে পি এফের টাকা তুলেছেন ছাঁটাই হয়ে যাওয়া ১০ হাজার কর্মী এবং চাকরি ছেড়ে দেওয়া ২০ হাজার কর্মী।** পশ্চিমবঙ্গে কোনো সরকারি প্রতিবেদনে এই বিপুল সংখ্যক কর্মীর ছাঁটাই এবং ইস্তফার বিষয়টির উল্লেখ নেই। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা কি অবস্থায় আছেন নিচের পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট হবে:

নমুনা ☐ ২. সারা ভারতে বকেয়া পি এফ এর শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ।

	ছাড়প্রাপ্ত টাকা (কোটি)	ছাড়প্রাপ্ত নয় টাকা (কোটি)	মোট টাকা (কোটি)
পশ্চিমবঙ্গে '৯১	১০৯.২৪	৫.৪৪	১১৪.৬৮
ভারতে '৯২	১৩৫.২১	৯৪.২৬	২২৯.৪৭
পশ্চিমবঙ্গে	১১৬.২৫	৮.৩০	১২৪.৫৫

সারা ভারতে বকেয়া বেড়েছে এক বছরে ১.৪৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ৯ শতাংশ। বছর বছর বকেয়া বেড়ে যাওয়া নিশ্চয় 'কর্মদক্ষতা'-র প্রমাণ নয়।

নমুনা ☐ ৩.

▶ মোট ৩২৪৩ টি সংস্থার বিরুদ্ধে পি এফ আইনের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী কেস করা হয়েছে। ৯২ সালে ৪৮ টি ক্ষেত্রে পুলিশ কেস শুরু হয়েছে। (৯১ সালে সংখ্যাটি ছিল ১১২)

▶ পি এফ আইনের ৭ এ ধারানুযায়ী ধারাবাহিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

▶ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯ ধারা প্রয়োগে ৪৮ টি কেসে মালিকদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে। পুলিসি ব্যবস্থার কি ফল হয়েছে তার উল্লেখ নেই।

▶ পি এফ আইনের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯ ধারা মোতাবেক কয়েকটি সংস্থার পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এম এ এম সি-র (কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত সংস্থা) ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট 'সিজ' করা হয়। ফলে আদায় হয় ২.৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সংস্থাটির বকেয়ার পরিমাণ ১২ কোটি টাকা। যেসব শিল্পসংস্থা পি এফ বকেয়া রেখেছে তাদের চরিত্র, তাদের অবস্থান বিভিন্ন রকমের।

ছাড়প্রাপ্ত সংস্থা			ছাড় না পাওয়া সংস্থা	
কারণ	টাকা (কোটি)	কারণ	সংস্থার সংখ্যা	টাকা (কোটি)
(ক) কারখানা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে	৩.৪৯	(ক) বন্ধ সংস্থা	৭৮	৯২.৯০
(খ) আদালতে বিচার্য আছে	১২.৪৮	(খ) আদালতে বিচার্য আছে	৫৬	১৩০.৫৫
(গ) বি আই এফ আর এর আওতায়	৪৮.৯২	(গ) আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ	৯	৮.৯৮
(ঘ) ইনস্টলমেন্ট স্কিমের আওতায়	১৫.৩৮	(ঘ) অধিগৃহীত হওয়ার আগে এন টি সি মিলগুলিতে	১৪	৫৯.০০
(ঙ) অন্যান্য	৩৫.৯৮	(ঙ) অধিগৃহীত হওয়ার পরে বা সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত সংস্থা	৮	৪৮.০০
	মোট ১১৬.২৫	(চ) আদালতের মনোনীত রিসিভারের পরিচালনায়	১৮	৩০.০০
		অন্যান্য	১০৫০	৪৬০.৭৭
			১২২৫	৮৩০.২০

▶ অতঃপর রাজ্য পুলিশ। চোর পুলিশ খেলা কেমন চলছে এবার দেখা যাক।

৩.১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ও ৪০৯ ধারানুযায়ী যে কেসগুলিতে পি এফ অফিসার বা পুলিশ নিজেই এফ আই আর করেছে ৩১.৪.৯১ পর্যন্ত :

	ভারতে	পঃ বঙ্গে	
এফ আই আর			
(ক) অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	৬৫৬০	৩১৮৫	এক বছরের বেশি এফ আই আর হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, ভারতে — ৫০৩৬টি সংস্থায়, পঃ বঙ্গে ২২৫৩টি সংস্থায়।
(খ) পুলিশ নিজেই যে সব এফ আই আর করেছে	২৩৬	২৭	
(গ) কেস ছেড়ে দিয়েছে	২৪০	—	
(ঘ) চালান করেছে আদালতে	২৭	—	
	৭০৬৩	৩২১২	

এ রাজ্যে পুলিশ যে কত সক্রিয়, পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাতদিন তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অপরাধ কম — মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের উক্তি তো প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকারি সংস্থারই করা এতগুলি এফ আই আর-এর ভিত্তিতে অপরাধীদের কেন যে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না — এর জবাব দিতে সরকার মোটেই রাজি নয়।

৩.২ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৯৮৭ সালের পর থেকে

- পি. এফ-এর টাকা জমা পড়েনি। পরিমাণ ১২ কোটি টাকা।
- ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির প্রায় ১৮ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
- রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৭ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে এই সব সংস্থায় অবসরের পর কর্মীরা পি এফ-এর টাকা পাচ্ছেন না।

৩১.৩.৯২ পর্যন্ত সারা ভারতে ছাড়প্রাপ্ত	
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়	৪৩.১০
ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থায়	৯২.১০
১৬১টি সংস্থায় মোট	১৩৫.২০
পশ্চিমবঙ্গে ছাড়প্রাপ্ত	
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়	৩১.৩০
ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থায়	৮৪.৯৫
৮২টি সংস্থায় মোট	১১৬.২৫

কিছু কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকারি সংস্থায় বকেয়ার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

	৩১.৩.৯২	৩১.৩.৯২	গত বছরের তুলনায় বেশি
১. এম এ এস সি	১১৮৫.৯৫	৮৫৮.২২	৩২৭.৭৩
২. জেসপ	৬৯৫.০৬	৬৯৫.০০	৩০০.০০
৩. ব্রেথওয়েট	২৯৫.১৬	২৪৬.১০	৪৯.০০
৪. টায়ার কর্পোরেশন	৩৯.৬১	২৫.৫০	১৪.১০
৫. সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন	১২৮.৪৭	৭৩.৪৫	৫৫.০২

পূর্ণাঙ্গ তালিকায় এমন অনেক সরকারি সংস্থার কথাই জানা যাবে। অপরাধ আছে, অপরাধী আছে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার আইন-কানুনও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো কাজেই লাগে না। সাজা পেল সেই, যার পকেট কাটা গেল, যার সঞ্চিত অর্থ ছিনতাই হল। সরকার আইন তৈরি করেছে। সরকার সে আইন নিজেই মানে না। যে আইনের প্রতি সরকারের নিজেরই শ্রদ্ধাবোধ নেই, কি করে তাঁরা আশা করেন, অন্য মালিকরা তা মেনে চলবেন বা তাঁরা মানতে বাধ্য হবেন। এতো গেল পি এফ তহবিলের রক্ষাকর্তা যেখানে সরকারি সংস্থা, তার কথা। কিন্তু যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকদের প্রতিনিধিদের যৌথ নিয়ন্ত্রণে পি এফ তহবিল পরিচালনা হয় সেখানে কেন বকেয়ার দীর্ঘতালিকা? পি এফের টাকাটা দুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; এক, ছাড়প্রাপ্ত যা কিনা শ্রমিক মালিক যৌথ প্রতিনিধিত্বে নিয়ন্ত্রণ হয় আর দুই ছাড়প্রাপ্ত নয় এমন সংস্থা যে টাকাটা পি এফ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গে ছাড়প্রাপ্ত সংস্থার বকেয়াই বিপুল ১১৬.২৫ কোটি টাকা। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের টাকা থাকলে টাকা ফেরত পাওয়া বা জমা হওয়ার নিশ্চয়তা বাড়বে এমনটা আশা করেই পঃবঙ্গের বেশির ভাগ সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী এই স্কিমে সামিল হয়েছিলেন অথচ আজ বিপরীত চিত্র। এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রমিক নেতা শ্রমিক আন্দোলনের সুফল এবং শ্রমিকদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করেছেন। ৯০ সালে সংশোধিত কেন্দ্রীয় পি এফ আইনে ছাড়প্রাপ্ত সংস্থার বকেয়া টাকার জন্য শুধু মালিক প্রতিনিধি নয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এখানেও সেই আইন আছে। আইনভঙ্গকারী, দুর্নীতিপরায়ণ শ্রমিকদের অর্থ তছরুপকারী শ্রমিক নেতা আছে। কিন্তু নজির নেই এই আইন প্রয়োগের।

পি এফ কমিশনার বলেছেন ৪০৬ ও ৪০৯ ধারানুযায়ী দায়ের করা অভিযোগে জুট মিলের মোট ৩২ জন ডিরেক্টরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। ৯০-৯১ সালে মোট জুট মিলগুলিতে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ৯১-৯২ সালে বকেয়ার পরিমাণ হয়েছে ৭৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। পঃবঙ্গে মোট পি এফ বকেয়ার ৬৫ শতাংশ জুট মিলগুলিতে। রাজ্য পি এফ অফিসের সক্রিয়তার ফল ফলেছে। মাত্র ২ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। যদিও সর্বভারতীয় পি. এফের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফল নাকি আরও ফলত; কিন্তু জুটের শ্রমিকরা যে গত বছর তিন মাস ধর্মঘট করলেন তার ফলে আদায়টা কমে গেল। অনেকগুলি শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিক নেতাই কেন্দ্রীয় পি এফ সভায় উপস্থিত ছিলেন। জানিনা তারা কি বলেছেন, কারণ রিপোর্টে বিষয়টির উল্লেখ নেই। যতদূর জানি শ্রমিক সংগঠনগুলি ধর্মঘট ডেকেছিলেন যে সব দাবির ভিত্তিতে তার মধ্যে বকেয়া পি এফ জমা দেওয়ার দাবিও ছিল। বিষয়টির উল্লেখ এজন্য করা হল। কারণ কেন্দ্রীয় পি এফ অছি পরিষদ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে সূক্ষ্ম হলেও এমন একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে, পি. এফ অফিস আরও সক্রিয় হতে পারত বকেয়া আদায়ে, খালি শ্রমিকরা ধর্মঘট করল

তাই।.... কিন্তু বছরের পর বছর এই চটশিল্পের শ্রমিকদের পি এফ-এর টাকা মাইনে থেকে কেটে নিয়ে মালিকরা জমা দিচ্ছে না। মিল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। শ্রমিকরা অবসর এর পর ১০ বছর বাদেও পি এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা পাননি। ধর্মঘট তারা করেননি। সে সব বছরে পি এফ-এর সরকারি কর্তারা কি করছিলেন? তাঁদের কাজের নমুনা তো তাঁরাই লিখে রেখেছেন ফেলে আসা বছরগুলির প্রতিবেদনের পাতায় পাতায়।

নমুনা । ৪. বার্ষিক ই পি এফ কমিশনারের প্রতিবেদনে বিষয়টির উল্লেখ আছে। পি. এফের চাঁদা ১০ শতাংশ জমা দেওয়ার আদেশ কার্যকর করেনি বেশ কিছু সংস্থা। এনফোর্সমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে বিষয়টি দেখার জন্য। ১০ শতাংশ চাঁদা দিতে হবে না সেই সব সংস্থাকে :

(১) যে সব সংস্থায় ৫০ জনের কম কর্মচারী কাজ করেন।

(২) রুগ্ন শিল্প আইন 'সিকা' অনুযায়ী যে সব সংস্থা রুগ্ন ঘোষিত হয়েছে।

(৩) যে সব সংস্থার পুঞ্জীভূত লোকসান মোট সম্পদের তুলনায় বেড়ে গেছে ও চলতি বছরে নগদে লোকসান হচ্ছে।

এই কারণগুলি যে সব শিল্প সংস্থায় প্রযোজ্য নয় তাদের ১০ শতাংশ হারে পি এফ জমা দেওয়া আবশ্যক।

রাজ্যের মোট ২২ টি শিল্প সংস্থায় ১০ শতাংশ হারে পি এফ জমা দেওয়ার নির্দেশকে অমান্য করা হচ্ছে। তার মধ্যে ১৫ টি কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা, ২ টি রাজ্য সরকারী সংস্থা, ৫ টি ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা।

নমুনা । ৫. গত বছরে আমাদের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, শ্রমিকরা টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু জমার 'স্লিপ' হাতে পাননি (Pending Slip)। সারা দেশে সংখ্যাটা ছিল ১,৩৬,৫৩,৩৭৫। ১৯৯২ সালের যে হিসেব সারা ভারতের রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে সেই অনুযায়ী মোট বকেয়া 'স্লিপ'-এর সংখ্যা ৯১,১৩,০৮৭ কিন্তু এ রাজ্যে ছবিটা একেবারেই অন্যরকম :

পশ্চিমবঙ্গে	১৯৮৮	৫.৮৯.১২৯ লক্ষ
	১৯৮৯	৭.৭৩.৪৮৪ ..
	১৯৯০-৯১	১২.৩০.২০৩ ..
		২৫.৯২.৮১৬
এর মধ্যে মালিকদের দোষে		১৫.২৯ লক্ষ
পি. এফ অফিসের দোষে		১০.৬৪ ..
		২৫.৯৩ লক্ষ

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

▶ সারা ভারতে মোট পি এফ ভুক্ত কর্মচারী ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৫ হাজার।

▶ আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ (Domestic Savings) ৯০-৯১ সালে ছিল ৭১৮৯৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে পি এফ আইন অনুযায়ী জমার পরিমাণ ছিল ৪১৫৫ কোটি টাকা। মোট জাতীয় সঞ্চয়ের ৫.৭৮ শতাংশ।

▶ বিভিন্ন সরকারি 'সিকিউরিটি' এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থায় লগ্নী করা আছে পি এফ তহবিলের ২৭ হাজার কোটি টাকা।

▶ পি এফ ই এস আই, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্মীদের গ্র্যাচুইটি সব ধরনের শ্রমিক

কর্মচারীদের প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা সরকারের কাছে জমা আছে। যাদের টাকা নিয়ে এই টাকার পাহাড়, 'জাতীয় উন্নতির' গালগল্প, তারাই চরমতম এক বঞ্চনার শিকার। বরানগর জুটের আড়াই হাজার শ্রমিক, হনুমান জুটের ৫০০ শ্রমিক, অবসরের পর শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন এক বুক কান্না নিয়ে। অভাবে আত্মহত্যা করছেন সুলেখার শ্রমিক। বজবজ জুট মিলের শ্রমিক কিংবা অ্যামকোর শ্রমিকদের বউ, ছেলে, মেয়ে। একদিকে হাজার হাজার শ্রমিকের অনাহার, মৃত্যু, আত্মহত্যা অন্যদিকে তাদেরই পকেট কেটে তুরানো বিভিন্ন সঞ্চয়ের নামে, চিকিৎসার নামে কোটি কোটি টাকার তহবিল ভেঙে 'মোচ্ছব' চলছে দেশজুড়ে। এটা সীমাহীন অমানবিকতা আর সরকার তার 'দর্শক'।

রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য : ২৬ শে মার্চ ৯২ কেন্দ্রীয় পি এফ অছি পরিষদের বৈঠকে ঠিক হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকার বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল করা হবে। যে সমস্ত সংস্থায় মালিকরা শ্রমিকদের টাকা কেটে নিয়ে জমা দেন নি সেই সব সংস্থার শ্রমিকদের পুরো প্রাপ্য টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া ৫ বছরের বেশী বন্ধ হয়ে গেছে এমন সংস্থাগুলিতে ও এন টি সি মিলের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হবে।

সরকারি শ্রম দপ্তর কেমন চলছে : ১৯৯৩-এর এই প্রতিবেদন শেষ করার আগে, ১৯৯২-তে শ্রমিকদের দাবি, ধর্মঘট ও একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। ৯২-এর 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ চুক্তিটির কথা বলা হয়েছে ফলাও করে। ১৭ ই মার্চ ১৯৯২ চট শিল্পের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। চুক্তিতে বলা হয়েছে, এই শিল্পে বিপুল পরিমাণ ই এস আই, গ্র্যাচুইটি আইনানুযায়ী পি এফ বকেয়া রয়েছে। মালিক পক্ষ গ্র্যাচুইটি আইনানুযায়ী দ্রুত টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। মালিক পক্ষও তা সমর্থন করছে। তাঁরা দেখবেন যাতে বকেয়া ই এস আই, পি এফ জমা পড়ে। মালিক পক্ষ লক্ষ্য রাখবে যাতে শ্রমিকরা প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি, পি এফ টাকা ফেরত পান। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এই সব পি এফ ই এস আই, গ্র্যাচুইটির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলোচনা করবেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা আই জে এম এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আই জে এম-এ বহির্ভূত কিছু মিল মালিক যেমন, কানোরিয়া জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর স্বাক্ষরকারী ছিলেন। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ১২ মাস পরে (১৮ ই মার্চ) কানোরিয়া জুটের (শিজবেড়িয়া) ৫৪০ জন শ্রমিক বি আই এফ আর কে জানাচ্ছে দীর্ঘ দুবৎসর আগে অবসর নেওয়া ৪৭০ জন শ্রমিক তাদের **পি এফ গ্র্যাচুইটির টাকা পান নি।**

এটা কোনো বিরল ঘটনা নয়। এ রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও তাদের পরিবার কেমন আছে জানতে চাইলে এমন ঘটনার হদিশ পেয়ে যাবেন সহজেই। কেউ যদি জানতে চান, আমাদের রাজ্য সরকার এ সব নিয়ে কি ভাবছেন, একটা কথাই বলা যায় যে, ৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর শ্রম সচিবের সময় হয়নি এ সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য 'আঞ্চলিক রাজ্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড'-এর মিটিং' ডাকার। আর, শ্রমমন্ত্রী শান্তিতে ভাত ঘুম ঘুমোচ্ছেন এ ছবি তো নিশ্চয়ই আপনারাও দেখেছেন !

তথ্য সূত্র

১। EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION, WEST BENGAL, 80th Regional Committee Meeting (E.P.F), 18th Sept. 1992 —— A Report.
২। 39th ANNUAL REPORT 1991-92, NEW DELHI.
৩। BUSINESS STANDARD, 3-1-93, 30-12-92.
৪। TELEGRAPH, 30th March, 1993.
৫। 17th March, 1992 Labour Commissioner, West Bengal এর স্বাক্ষর করা চটশিল্পের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের ছাড়প্রাপ্ত (Exempted) সংস্থাগুলির বকেয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর তালিকা (৩১.৩.৯২ পর্যন্ত)

(সংস্থার নাম ও বকেয়া পি. এফ.এর পরিমাণ লক্ষ টাকায় দেওয়া হল)

চটশিল্প সংস্থায় বকেয়া পি এফ (ছাড়প্রাপ্ত)

অম্বিকা জুট মিলস লিঃ - ২৩৮.৫২, মেঘনা মিলস লিঃ - ৪৯৬.০০, এ্যাঙ্গাস কোঃ লিঃ - ৬২২.৪৩, ভিক্টোরিয়া জুট মিলস - ৫২৭.০০, ফোর্ট উইলিয়ম - ৪৩.৯০, নদীয়া মিলস - ৩৭৯.৫০, কাঁকিনাড়া কোঃ লিঃ ৫২৩.২৫, ইস্টার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ - ১৭৩.০২, শ্রী গৌরীশঙ্কর জুট মিলস লিঃ - ১২৩.২৯, হাওড়া মিলস - ৪০৫.৭০, বরানগর জুট - ৪১৭.০০, ডেলটা জুট কোঃ লিঃ - ৫৩১.৭০, নৈহাটি জুট মিলস লিঃ - ১৩৯.০০, আগরপাড়া কোঃ - ২৮৩.০০, শ্যামনগর জুট - ৫০২.২৫, গৌরীপুর কোঃ লিঃ - ৩২৯.১৪, কেলভিন জুট - ৪১০.০০, টিটাগড় জুট কোঃ লিঃ - ৫৮৩.৫০, গ্যাঞ্জেস ম্যানুফ্যাকচারিং কো লিঃ - ১৩.০০, নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলস লিঃ - ৪৪২.৭০, নর্থ ব্রুক জুট মিলস লিঃ - ১১২.০০, বজবজ জুট - ২০৬.৯৯ ডালহৌসি জুট মিলস লিঃ - ৫৬.৫০, কামারহাটি জুট মিলস - ১২.২৮, ওয়েলিংটন জুট মিলস - ৭.৩৬, প্রবর্তক জুট মিলস - ২২.৩৮, এ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিলস - ৩০.০০। মোট পরিমাণ ঃ ৭৬৩১.৪১।

কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় বকেয়া পি এফ (ছাড়প্রাপ্ত)

বার্ন এ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ - ১৪০.১০, ইন্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড এ্যাণ্ড ওয়াগন লিঃ - ২৪.৬১, বেঙ্গল কেমিক্যালস এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ - ১৬.৩০, টায়ার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া - ১৫.০৩, ইউনিট ন্যাশনাল রবার লিঃ - ৩০.০০, ব্রেথওয়েট এ্যাণ্ড কোঃ লিঃ - ৩৫১.০৬, জেশপ এ্যাণ্ড কোঃ লিঃ - ৬৯৫.০০, মাইনিং এ্যাণ্ড এ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন লিঃ - ১,১৮৫.৭৫, রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ - ১৫৮.৭৬, স্মিথ স্টেইনস্ট্রিট ফার্মাসিউটিক্যালস - ২৮.৭০, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ - ৩.৬০। মোট পরিমাণ ২৬৪৮.৮৮।

রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় বকেয়া পি এফ (ছাড়প্রাপ্ত)

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভলমেন্ট কর্পোরেশন - ৪.০০, ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার - ২৯৫.১৬, ইণ্ডিয়ান হেলথ ইনস্টিটিউট ল্যাবরেটরি - ৫.০৬, সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট - ১২৮.৪৭, ভারত প্রসেস এ্যাণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স - ৫.০০। মোট পরিমাণ ঃ ৪৩৭.৬৯।

অন্যান্য বকেয়া পি এফ

বর্ণী লিমিটেড - ২২.৭৮, ডব্লু. এস. ক্রেসওয়েল কোঃ প্রাঃ লিঃ - ৩.৯৬, শালিমার রোপ ওয়ার্কস লিঃ - ৫.০৩, ডানবার মিলস লিঃ - ৬৪.৭৫, বাসন্তী কটন মিলস লিঃ - ৪.৩২, রবার্ট হাডসন ইণ্ডিয়া লিঃ - ১.৭৬, স্টিল এ্যাণ্ড এ্যালায়েড প্রোডাক্টস লিঃ - ২.২৫, হিমালয়া শিপিং কোঃ লিঃ - ১.৪৭, ইস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস - ২.২৫, ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ - ৭.২৫, যুগান্তর লিমিটেড - ৬১.০৯, অমৃতবাজার পত্রিকা লিঃ - ১৪৩.৯১, ভারত ব্রেকস এ্যাণ্ড ভালবস লিঃ - ১৬.৫০, আমেরিকান রেফ্রিজারেটর - ১০.৮৭, শালিমার গ্রুপ - ১.০২, ইণ্ডিয়া পেপার পালপ কোঃ লিঃ - ৭৭.৩৪, ফ্রাঙ্করস এ্যাণ্ড কোঃ - ১.১১, ক্রোবস এ্যাণ্ড সিয়ে - ২.৬৪, শ্রী দুর্গা কটন মিলস - ১৮.৬৩, এ্যাঙ্গলো ব্রাদার্স - ১৯.৮০, ন্যাশনাল পাইপস এ্যাণ্ড টিউবস লিঃ - ১.৭২, কন্টেনার্স এ্যাণ্ড ক্লোজার লিঃ - ২১.৬৯, বেঙ্গল সল্ট এ্যাণ্ড কোঃ লিঃ - ১০.৮০, সুর এনামেল এ্যাণ্ড স্টাম্পিং লিঃ - ৪.৮৩, মোহিনী মিলস লিঃ - ৮৫.৭৫, এ্যালুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ - ১৯.১৫, স্কট এ্যাণ্ড স্যাক্সবি লিঃ - ১৬.০০, বাউরিয়া কটন মিলস লিঃ - ১৭৩.৭৩, সাইমন ক্রেভস (ই) লিঃ - ১১.১০। সেন পণ্ডিত প্রাইভেট লিঃ - ১১.৫৩, স্টাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ - ১১.৭৮, টিটাগড় পেপার মিলস - ১৩.১২, ঈগল লিথোগ্রাফি কোঃ (প্রা) লিঃ - ১.৯৮, পাস্তুর ল্যাবরেটরি (প্রা) লিঃ ১.৭০, রামনগর কেন এ্যাণ্ড সুগার কোঃ লিঃ ৫১.৪৬। মোট পরিমাণ - ৯০৪.০৭।

পশ্চিমবঙ্গের ছাড়প্রাপ্ত নয় এমন সংস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়ার তালিকা ১ লক্ষ টাকার উপরে যাদের বাকি পড়েছে (৩১.৩.৯২ পর্যন্ত)

[সংস্থার নাম ও বকেয়ার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) দেওয়া হল]

১. ছাড়প্রাপ্ত নয় এমন চটকলে বকেয়া

ভারত জুট মিলস (হাওড়) - ২৭.৭৮, ক্যালক্যাটা জুট - ৪৩.০০, প্রেমচাঁদ জুট মিলস লিঃ - ৪৮.৮৯, নস্করপাড়া জুট মিলস - ৩১.৮৮, এম্পায়ার জুট কোঃ - ২৩২.৬২। মোট পরিমাণ — ৩৮৪.১৭

২. ছাড়প্রাপ্ত নয় এমন কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় বকেয়া পি এফ

মহালক্ষ্মী কটন মিলস - ৩৮.০০, বঙ্গশ্রী কটন মিলস - ৩১.৮৪, জ্যোতি উইভিং ফ্যাক্টরি - ১৮.৪২, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস - ৯১.৬৪, রামপুরিয়া কটন মিলস - ৭৬.৬২, আরতি কটন মিলস - ৪২.৮৮, মণীন্দ্র মিলস - ১২.১৪, বেঙ্গল কটন এ্যান্ড স্পিনিং মিলস - ৩০.৬৩, ঐ মিল নং-২ - ১৪.৫৬, সোদপুর কটন মিলস - ২০.২২, বেঙ্গল টেক্সটাইলস মিলস - ২৬.০১, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া - ৮.৯৫, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (২) - ৩.১৪, ন্যাশনাল রবার ওয়ার্কস (টি সি আই) - ১.২৮, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিঃ - ৬৫.০৯, বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড এণ্ড কোম্পানি - ২.৫১, তেশপ এণ্ড কোম্পানি লিঃ - ৫.৩৪। মোট পরিমাণ - ৪৮৯.২৭।

৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগৃহীত ছাড়প্রাপ্ত নয় এমন সংস্থায় বকেয়া পি এফ

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ - ২.৬০, ঐ ফ্যাক্টরি - ২.১৮, বসুমতী কর্পোরেশন - ৩৪.২৮, ন্যাশনাল আয়রন এ্যাণ্ড স্টিল কোঃ লিঃ - ১৭.১৯, কার্টার পুলার ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ ১৩.০০, কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস ফ্যাক্টরি - ৯.৮২, স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন - ১৫.৬৩, ভারত প্রসেস এণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং - ৪৫.৮৭। মোট পরিমাণ — ১৪০.৫৭।

৪. অন্যান্য বকেয়া পি এফ

চ্যাং টং টি এস্টেট - ২২.৬৫, পুবাং টি এস্টেট - ৩.৩৫, মুনডাকোটি টি এস্টেট - ১২.৫০, হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট - ২.৩৮, রুঙ্গমক টি এস্টেট - ৪.৫৯, সিডার টি এস্টেট - ৩.১০, রুঙ্গমিত টি এস্টেট - ৩.১২, ভাট্টকভার টি এস্টেট - ২.৬৩, পাসোক টি এস্টেট - ৭.৫৭, নরবাও টি এস্টেট - ১.৫৪, সেলিম হিল টি এস্টেট - ৪.৪৬, সিওলি টি এস্টেট - ১.৮৭, মানঝা টি এস্টেট - ২.৩৮, পুটিনবারি টি এস্টেট - ১.৭৭, চাঁদমণি টি এস্টেট - ২১.০০, নক্সালবাড়ী টি এস্টেট - ২.৭৫, শচীন্দ্রনাথ টি এস্টেট - ৬.৪৮, মিশন হিল টি এস্টেট - ৩.৫৪, ডেমচিমা টি এস্টেট - ৯.৭৫, রেডব্যাঙ্ক ডি এস্টেট - ১.০৬, লুকসান টি এস্টেট - ৬.০০, আনন্দপুর টি এস্টেট ৬.৮২, কনোরিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ - ১৫.৭০, ক্যালকাট ফ্যান ওয়ার্কস - ১৫.০০, ক্যানটন কারপেন্টারি - ২০.০০, মেট্রোফ্লো কর্পোরেশন (প্র) - ২.৪৮, লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হসপিটাল - ৩.৫৮, ডি এন দে হোমিও কলেজ - ২.৬৪, সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড - ১৪.০০, হিন্দুস্থান স্মল টুলস - ৮.০০, এ্যাসোসিয়েটেড এ্যাসবি ইণ্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড - ২৩.০০, সিকো ইন্ডিয়া লিমিটেড - ৪.০০, ফিজলি কো-অপারেটিভ - ২.০১, ব্যানার্জি এণ্ড চক্রবর্তী ৫.০৮, বেলুড় গ্লাস ওয়ার্কস - ২.৬৬, ডোমিনিয়ন রবার - ৩.৮৮, ইস্ট এণ্ড পেপার ইন্ডিয়া - ৪১.৮৪, হিন্দোক ইঞ্জিনিয়ারিং - ৪.৮৮, হিন্দু গ্যালভানাইজিং - ৮.০০, হাওড় এণ্ড ওয়ার প্রাঃ - ৫.৩০, ইন্দো-জাপান স্টিল লিমিটেড - ৫৫.০০, ইন্ডিয়ান রবার গুডস ম্যানু - ২.৪২, হাওড়া আয়রন এণ্ড স্টিল - ৬.২০, ইন্ডিয়ান রবার গুডস ম্যাঃ - ৪.৪৬, কে-মার বাগসোই ম্যাঃ - ১৬.৫২, ওরিয়েন্টাল রিসার্চ কেমিক্যালস - ৩.২৬, প্রীতি পেপার বোর্ড মিলস - ৫.২৮, পিপলস মোটর ইং - ২.২৪, পিপলস মোটর ইং - ৪.২২, রেরোল বার্ন - ২৩.৩০, র‍্যালিরাম আগরওয়ালা - ৫.৬০, রিষড়া সেবাসদন - ১.৬৮, শালিমার রোপ ওয়ার্কস - ৬.৯৪, আর কে ইন্ডাস্ট্রিজ ১.২৫, শ' এ্যান্ড কোম্পানি - ১.৫৪, শ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস - ৭৭.৬৮, শ্রী বজরং ইলেকট্রিক্যাল

স্টিল - ৫.৪৮, এস আই ইঞ্জিনিয়ারিং ২.০২, খিসা ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ - ২.১০, দি ইন্ডিয়া মেশিনারি - ১৪.৮৪, ঠাকুরদাস সুরেখা - ১.৭০, ঠাকুরদাস সুরেখা (আরেকটি সংস্থা) ৪.৪৮, ইউনিয়ন ইঞ্জিনিয়ারিং - ১.৯০, রেমণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং - ১.৯০, আগরওয়াল কেমিক্যালস - ৯.৩২, আলব্র্যাকো মেটাল ওয়ার্কস ম্যানুফ্যাকচারিং (প্রাঃ) লিমিটেড - ৮.০৪, বি এস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন - ১০.২৬, দ্য এস জি আর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিমিটেড - ১২.৪৯, ওয়েবার্ড ইন্ডিয়া লিমিটেড - ৮.৪২, নিও পাইপস এ্যান্ড টিউবস - ১৭.০৩, লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলস - ৪৩.০০, দি স্মল টুলস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমি. - ১১৫.৭৬, কমলা বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি - ৪.০৯, ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোম্পানি লিমিটেড - ৫.১২, ডঃ বোসেস ল্যাবরেটরি - ২.১২, হিমালয়ান কো-অপারেটিভ অফ মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন লিঃ - ২৮.২৬, ইসলামপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি - ৪.৫২, গৌর কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ইউনিয়ন লিঃ ২.৫২, আম্পু বিড়ি ওয়ার্কস - ৬.০২, মুর্শিদাবাদ বিড়ি ওয়ার্কস - ১.৮২, জৈন বিদ্যালয় - ৭.৯৩, ভেলানন্দ ন্যাশানাল বিদ্যালয় - ৪.৪৪, জুলিয়েন ডে স্কুল - ২.১৮, খালসা মডেল স্কুল - ১.২৮, শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর তিরাপন্থী বিদ্যালয় - ২.৩০, এ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রাইজ - ১.৭৪, সুবর্বন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস - ৩.৯০, ইনটেক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস - ২.৩৫, ভগবতী পেপার এণ্ড বোর্ড মিল - ৩.৬৪, হিমালয় রবার প্রোডাক্টস - ১৪.৩৯, ভ্যাক্স ইনস্টিটিউট লিঃ - ৮.৪০, পি ভি সি ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ - ১.২০, ক্যালকাট ইণ্ডাস্ট্রিজ - ১.৫২, পি সি চন্দ্র এ্যাণ্ড সন্স - ১.৯০, প্লাস্টিক পাউডার প্রাঃ লিঃ - ১.১০, আনন্দ মেটাল এ্যানড স্টিল - ৪.৪০, ন্যাসকো বিস্কুট - ২.১৫, সেন অ্যাণ্ড পণ্ডিত (প্রাঃ) লিমিটেড - ৩.১৬, নিউ টোব্যাকো কোঃ লিঃ - ১৬.৬৫, ইত্যাদি প্রকাশনী - ১৩.৫৪, উলকম্বারস ইন্ডিয়া লিঃ - ২৪.৩৯, পুরুলিয়া স্পন পাইপ - ১.৮৭, জেফার ফার্মাসিউটিক্যালস - ৮৩.০০, বি. এম. জি ফার্মাসিউটিক্যালস ১১.৯২, মেসার্স বি মুখার্জি এ্যাণ্ড কোঃ - ২.৭৬, পাল এ্যাসোসিয়েটস - ২.৩৯, বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কোঃ - ২.৭০, এস সি আই এল ৮০.০০, অনিমা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং - ১.১২, দাশ কনসালটেন্সি - ১.৪৩, ফেভারিট স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিঃ - ৯০.১০, আমেরিকান রেফ্রিজারেটর - ৬.৪০, মেসার্স লাল চাঁদ রায় - ৩.৪০, ইকনমিক ট্রান্সপোর্ট - ৩.১২, এস এল মেটালস - ৩.৯২, হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন - ৩.২৪, আর বি এস রবার ১.২৪, কল্পনা ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রাঃ) লিঃ - ১.৫০, এস এ বেস্ট নাট ইণ্ডাস্ট্রিজ - ১.৮৬, দুর্গাপুর ম্যালিয়েবলস্ - ৩.৯৭, ফার্মাস্টেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ - ৯.৪১, উষা এটলাস ইকুইপমেন্টস - ১৩.০০, হরাইজন ফার্মাসিউটিক্যালস (প্রাঃ) লিঃ - ১.৩০, পি সি এল হসপিটাল এ্যাণ্ড কলেজ - ৩.৩৮, হিন্দুস্থান আয়রন এ্যাণ্ড স্টিল কোঃ - ১০.৫৮, এ্যাসোসিয়েটেড পোর্সেলিন (প্রাঃ) লিঃ - ১২.২১, টেক্সওয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি - ৪.৫৫, জনপ্রিয় ফিনান্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড - ১০.৬৬, ইস্টার্ন পেপার মিলস - ৮৫.১৪, শরৎ টেক্সটাইলস - ৩.৭১, সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড - ৩.৬৮, হলম্যান ক্লাইমেক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ - ১৫.০৮, ভিনার লিমিডেট ফ্যাক্টরি - ২.৩৩, লাজপত ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড মেডিক্যাল হাইস্কুল - ১.০৩, বালিকা শিক্ষা সদন - ২.৪০, দিলীপ রায় (প্যাকেজিং এ্যাণ্ড বটলিং) - ৪.৩৬, দি আরগসি ফিনান্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডিয়া লিঃ - ৩.৫৫, জেমস লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ - ৫.০৮, ইস্টার্ন ম্যালিয়েবলস এ্যালায়েড প্রোডাক্টস - ২.৭৩, কোলে আয়রন স্টিল কোঃ লিঃ - ৩.৯৪, এনামেল নগর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন - ১.০১, নিরেকা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ - ২.৬৪, এম এ এন সি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ - ১.২০, প্রিন্ট এ্যাণ্ড ব্লক কনসার্ন প্রিন্টার্স - ১.২০, ইস্ট এশিয়া স্কিন কর্পোরেশন - ১৪.৫২, পাইওনিয়ার টিউবওয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ - ৬.২৯, টার্নকি ইন্টারন্যাশানাল লিঃ - ৫.৮০, জিপিজে লিমিটেড - ৪.০০, গুরু মার্কেটিং কোঃ (প্রাঃ) লিঃ - ১.১৪, সালসের মার্কেটিং কোঃ (প্রাঃ) লিঃ - ২.৬৭, ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এ্যাণ্ড হসপিটাল - ৩.৮০, জি কে খেমকা চেস্ট ক্লিনিক (ইউনিট) - ২.৯২, জি কে খেমকা চেস্ট ক্লিনিক - ২.৭৫, বালানন্দ আরোগ্য ভবন - ২.৮০, বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন - ২.৬৯, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল - ৩.৪১, কে. এল ফিরানি এণ্ড কোঃ লিঃ - ৬.০৬, ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্টিন, কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টস - ২.৭২, কাইলিতা ইণ্ডাস্ট্রিজ - ১.২৮, এ ভি জে ওয়্যার লিঃ - ৫.৩৭, রণা এন্টারপ্রাইস - ১.২৪, হিন্দুস্থান কাস্টিং এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং - ৩.২৪, এইচ গুরু ইনস্ট্রুমেন্টস কোঃ লিঃ - ৩.০৮, পাইওনিয়ার টিউবওয়েল (প্রাঃ) লিঃ - ৬.২৯, ভারত ইমিউনিটি - ১.৪০, গণপতি ইন্টারন্যাশানাল - ১.৯৪, মধুবন সিনেমা - ১.০২, হরেন্দ্র উইভিং মিলস কোঃ - ৪.০০।

শ্রমের পরিভাষা

বঞ্চনার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি

উৎপাদন ব্যবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন থাকে শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত পারিভাষিক শব্দগুলোতে। শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের আঙিনায় হাজির হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন পরিভাষা। 'ভাগাওয়ালা' বা 'কাটাউতি' যেমন কারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক দাপটের চেহারাটা স্পষ্ট করে, তেমনি 'ফার্মিং আউট' কিংবা 'ফাণ্ড সাইফনিং' শব্দগুলো শিল্প ক্ষেত্রে নয়া মালিকদের প্রবণতাকে চিনিয়ে দেয়। শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে প্রচলিত পুরনো এবং নতুন সব পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। এই পর্বে তারই কয়েকটা :--

ভাগদারি বা ভাগাওয়ালা : এঁরা বদলি শ্রমিকেরও বদলি হিসেবে কাজ করেন। মূলত চটশিল্পেই এদের ভাগাওয়ালা বলে। নামেই এঁদের পরিচয়। এঁরা ভাগে কাজ করেন। অর্থাৎ কোন বদলি শ্রমিক একদিনের কাজ পেলেন। কিন্তু তিনি পুরোদিনের কাজ করার বদলে আর একজনকে তার কাজের অংশবিশেষ করার জন্য নিযুক্ত করেন। একদিনের মাইনের একটা অংশ সেই বদলি শ্রমিক দেন ভাগাওয়ালাকে। কারখানার কাগজপত্রে তার সম্পর্কে কোনই নথি থাকে না। আগে চটশিল্পে এঁদের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকের ৫-১০ শতাংশ। কিন্তু এখন প্রায় ৩০ শতাংশ।

কাটাউতি : বিগত কয়েক বছরে চটকল মালিকদের আবিষ্কার এটি। কারখানা চালানোর তহবিলের অভাবের অজুহাতে মালিকরা বলছে, শ্রমিককে টানা কয়েক বছর ধরে তার বেতনের একটা অংশ কেটে কারখানা চালানোর তহবিলে রাখতে হবে। পরে মালিক শ্রমিককে সেই কেটে নেওয়া বেতনের অংশ ফেরত দেবেন। শ্রমিকরা এরই নামকরণ করেছেন কাটাউতি। মালিকরা আইনসিদ্ধ ভাবেই শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে 'কাটাউতি'র ব্যবস্থা করছেন। শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের বেতনের অংশ দিতে। ফেরত পাওয়ার কিন্তু কোন নিশ্চয়তা নেই। মালিক বদল হল তো টাকা মার গেল। বদল না হলেও মালিক টাকা ফেরত দিতে যে খুব একটা ইচ্ছুক তেমন নয়। এই কাটাউতির টাকা ফেরতের দাবিতেই গৌরীশঙ্কর জুট মিলে শ্রমিকরা বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে উঠলে ১৯৯০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পুলিসের গুলিতে এক শ্রমিক মারা যান। এই ঘটনার পরও কাটাউতি বন্ধ হয় নি।

ফুরন : এঁরা হচ্ছেন উৎপাদনভিত্তিক মজুরি পাওয়া শ্রমিক। অস্থায়ী শ্রমিকদের একটা নির্দিষ্ট বেতন থাকে। কিন্তু ফুরনদের স্তর অস্থায়ী শ্রমিকদের নিচে। মূলত অসংগঠিত শিল্পে ফুরন পদ্ধতি চালু থাকলেও সম্প্রতি বেশ কিছু সংগঠিত শিল্পেও বকলমে ফুরন প্রথা চালু হতে চলেছে। বহু কারখানা বা শিল্প বাজারের চাহিদার অভাবের অজুহাতে মাসের একটা অংশ উৎপাদন বন্ধ রাখছে। আইন-মাফিক উৎপাদন বন্ধ থাকলেও শ্রমিকদের পুরো বেতন পাওয়ার কথা। কিন্তু কারখানা বা শিল্প মালিকরা একটিই প্রস্তাব দিচ্ছে — যতদিন উৎপাদন, ততদিন বেতন। না হলে কারখানা পুরোপুরি বন্ধ। শ্রমিকদের সামনে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকছে না। ফলে স্থায়ী শ্রমিক থেকে এঁরা কার্যত পরিণত হচ্ছেন ফুরনে। বিভিন্ন শিল্পে অস্থায়ী বা ক্যাজুয়াল শ্রমিকদেরও একই হাল হচ্ছে।

১৪ নম্বর গ্যাং পাস : দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের পরিভাষা এটি। ঠিকাদারের অধীনে বিভিন্ন দলের মধ্যে ৩০ জন শ্রমিকের একটি দল। এঁদের অন্য কোন পরিচয় নেই। খাতায় এঁদের সম্পর্কে কোন নথি থাকে না। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে এঁরা মূলত কাজ করেন। কারখানাতে ঢুকলেও যেহেতু এঁদের ব্যক্তিগত কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় না, সেজন্য দুর্ঘটনা ঘটলে মৃত্যু বা শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির কোনই রেকর্ড থাকে না।

অ্যাসেট স্ট্রিপিং : বহু শিল্প মালিক শিল্পেরই সম্পদ নানা অজুহাতে বা গোপনে বাইরে পাচার করে। শিল্পের নিজস্ব সম্পদ বাইরে যেতে যেতে একদিন শিল্পেরই তহবিলে টান পড়ে। শিল্প রুগ্ন হয়। এখন বহু রুগ্ন শিল্পের রুগ্নতার কারণ খতিয়ে দেখার সময় দেখা গেছে যে মালিকরা সেই শিল্পের সম্পদ ছিনতাই করে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা লোটার ফলে শিল্প অচল হয়ে পড়েছে।

ফাণ্ড সাইফনিং : এক কথায় বলা যায় অর্থ পাচার। শিল্পের কাঁচা মাল কেনা বা উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় দাম বেশি দেখিয়ে বা কম দেখিয়ে শিল্পের অর্থ বাইরে পাচার করা হয়ে থাকে বহু সময়। মাল কেনার সময় দাম বেশি দেখিয়ে এবং বিক্রির সময় দাম কম দেখিয়ে প্রচুর পরিমাণে কালো টাকা তৈরি হল এবং তা গেল শিল্পের হর্তাকর্তা বা মালিকদের পকেটেই। ওদিকে শিল্প হল রুগ্ন।

ফার্মিং আউট : এখন খুব চল হয়েছে এই ফার্মিং আউটের। নিজের কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রেখে বাইরে ক্ষুদ্র শিল্প বা অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে অনেক কম মজুরি দিয়ে মাল উৎপাদন করিয়ে বাজারে পাঠানো হচ্ছে। এই বাইরে থেকে কাজ করানোর নামই ফার্মিং আউট। ফলে শিল্পের স্থায়ী শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দারুণভাবে। দিনে দিনে তাঁদের সংখ্যা কমছে। এমন কি বহু ক্ষেত্রে কারখানা বন্ধ থাকলেও বাজারে পণ্যের অভাব হচ্ছে না ফার্মিং আউটের জন্য।

ব্যঙ্গচিত্র : সর্বজিৎ সেন

পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শিল্পে যেভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে এ-দেশ এবং শ্রমিকদের অবস্থা যেভাবে অসহায় হয়ে যাচ্ছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে ঢাকা সে-কথা সহজেই বলা যায়। অথচ কলকারখানাগুলো যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থাভাব নয়, আসলে কারখানা চালানর চেয়ে বন্ধ করে দেওয়াতেই লাভ বেশি মনে করলে কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন মালিক।...

বন্ধ কারখানার বিপুল শ্রমশক্তির এই যে অপচয়, এর কী জবাব দেবে সরকার? এই যে কর্মহীনতা অথবা কাজ শিখেও সেটা ব্যবহার করতে পারার সুযোগ না পাওয়া, এর জন্য দায়ী কে?